KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ১১৫নং বেলিয়াঘাটা রোড, কল-১০
Collection : KLMLGK	Publisher : তরুণ চন্দ্র মিত্র
Title : চিত্র	Size : 7.25" x 9.5" 18.41 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : 1/2 2/3 3/1 3/2 3/3	Year of Publication : শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৫ কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৭ বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫৮ শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৮ কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৮
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সুহৃদ চন্দ্র মিত্র	Remarks :

I.D. Roll No. : KLMLGK

চিত্ত

মনোবিদ্যাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক
সুহৃৎচন্দ্র মিত্র

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত

তৃতীয় বর্ষ | শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৮ | দ্বিতীয় সংখ্যা

চিত্ত

সম্পাদক— সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম.এ., পিএইচ.ডি.

সহসম্পাদক— তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি. এস্‌সি.
সমীরকুমার বসু, এম.এ.

সম্পাদক পর্ষৎ— সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম.এ., পিএইচ.ডি.
তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি.এস্‌সি.
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম.এস্‌সি., এম.বি.বি.এস.
নগেন্দ্রনাথ দে, এম.বি., এম.আর.সি.পি., ডি.পি.এম., ডি.টি.এম্.
জ্ঞানেন্দ্র দাসগুপ্ত, এম.এ., পিএইচ.ডি.

সহযোগিবৃন্দ— শ্রীমতী কনক মজুমদার, এম.এস্‌সি.
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
বিজয়কেতু বসু, বি.এস্‌সি , এম.বি.বি.এস.
শ্রীমতী স্বপ্না দে, এম.এস্‌সি.
হিরন্ময় ঘোষাল
শ্রীমতী অরুণা হালদার, এম.এ., ডি.ফিল.
শীতাংশু চট্টোপাধ্যায়
রমেশ দাশ, এম.এ., পিএইচ.ডি.
অরুণ ভট্টাচার্য
সজনীকান্ত দাস

পরিচালক সমিতি— সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম.এ., পিএইচ.ডি.
তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি.এস্‌সি.
নগেন্দ্রনাথ দে, এম.বি., এম.আর.সি.পি., ডি.পি.এম., ডি.টি.এম.
নির্মলকুমার বসু, এম.এস্‌সি.
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ., এল.এল.বি.
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম.এসসি., এম.বি.বি.এস.
সমীরকুমার বসু, এম.এ.
এম. ডি. অমৃত
জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম.এ., পিএইচ.ডি.
প্রমদানাথ চৌবে, এম.এ.
অনাদিনাথ ঘোষাল, এম.এ., এম.বি.বি.এস.
তড়িৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম.এ.
রমেশচন্দ্র দাস, পিএইচ.ডি.

চিত্ত

নিয়মাবলী

১। "চিত্ত" ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পরবর্তী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খবর লইয়া জবাব সহ জানাইতে হইবে।

২। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধাদি মনোনয়নের ভার সম্পাদকের উপর থাকিবে।

৪। সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে প্রবন্ধাদির আবশ্যক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বিশেষ অংশ বাদ দিতে পারিবেন।

৫। এই পত্রিকার প্রকাশিত লেখা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে "চিত্ত"র সম্পাদকের লিখিত সম্মতি প্রয়োজন হইবে।

৬। যে সংখ্যায় যাঁহার লেখা প্রকাশিত হইবে সেই সংখ্যার দুই কপি পত্রিকা লেখককে বিনা মূল্যে দেওয়া হইবে।

৭। "চিত্ত"র বাৎসরিক চাঁদা ৩৲ (তিন টাকা) ; প্রতি সংখ্যার মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা মাত্র। পৃথক্ ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরে যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

সূচীপত্র

ইয়ুং-এর মতবাদ	—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫৩
আমি ও আমার মন	—বিমলকৃষ্ণ মতিলাল	...	৭৩
স্নেহের অন্তরালে	—তড়িৎকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	৭৬
চিন্তার প্রকৃতি	—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	...	৮০
সুখ-দুঃখ ও বাস্তব	—তরুণচন্দ্র সিংহ	...	৮৫
চরিত্র বিচিত্রা	—উদয়চাঁদ পাঠক	...	৮৮
লুম্বিনি সম্বন্ধে	...	...	৯৫

চিত্ত

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ॥
শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৮ ॥

ইয়ুং-এর মতবাদ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., এল. এল্‌বি.*

কার্ল গুষ্টাভ ইয়ুং বিশ্ববিখ্যাত মনোবিদ্। ছিয়াশি বছর বয়সে, গত ৬ই জুন (১৯৬১) তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। এই দীর্ঘ জীবন তিনি অতিবাহিত করেছেন মন-সম্বন্ধীয় নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যরাজি পরিবেশিত হয়েছে বহু গ্রন্থে, বক্তৃতামালায় এবং বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে।

১৮৭৫ সালের ২৬শে জুলাই সুইজার্ল্যাণ্ডের থরগাউ ক্যাণ্টনের অন্তর্গত কেজুইল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বেল শহরে আরম্ভ হয় শিক্ষাজীবন। সেখান থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক হবার পর কর্মজীবন আরম্ভ করেন। ১৯০০ সালে জুরিখস্থ বার্গোলসলি মানসিক হাসপাতালে এবং জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত চিকিৎসাকেন্দ্রে সহকারী মনোচিকিৎসকরূপে যোগদান করেন। ১৯০২ সালে অল্প কিছুদিনের জন্যে প্যারীতে গিয়ে প্রখ্যাত মনোবিদ্ পিয়ারী জ্যানের নিকট শিক্ষালাভ করেন। সেখান থেকে ফিরে জুরিখ হাসপাতালেই ব্লুলারের সহযোগিতায় গবেষণা আরম্ভ করেন; এরই ফল শব্দ-অনুষঙ্গ অভীক্ষা (word association test)। এই অভীক্ষার দ্বারা মানসিক গূঢ়ৈষার সন্ধান মেলে। এই সময়েই তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং ১৯০৭ সালে ফ্রয়েডের সহিত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ঘটে। তারপর কয়েক বৎসর তিনি ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং এর প্রধান ব্যাখ্যাকাররূপে পরিগণিত হন। ১৯১১ সালে তিনি আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ

* দর্শনশাস্ত্রের উপাধ্যায়, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা।

করেন। ক্রমশঃ ফ্রয়েডের সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটে এবং ১৯১২ সালে তাঁর 'The Psychology of the Unconscious' নামক গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে এ মতান্তর তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯১৩ সালে তিনি ফ্রয়েডীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে নিজের মতবাদকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে মনোনিবেশ করেন। নিজের এই মনোবিদ্যার নামকরণ করেন বৈশ্লেষিক মনোবিদ্যা (analytical psychology)।

ইয়ুং ভ্রমণ করেছেন প্রচুর। আদিম মনের স্বরূপের সন্ধানে তিনি মেক্সিকো, পূর্ব আফ্রিকা, ভূদান প্রভৃতি স্থানের আদিবাসীদের মধ্যে গিয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি থেকে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছেন বক্তৃতা দিতে। ভারতবর্ষেও তিনি এসেছেন, কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৩৭ সালে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রাচ্যের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। চীনদেশের তাও (Tao) সম্প্রদায়ের একটি যৌগিক প্রক্রিয়া সযত্নে অনুধাবন ক'রে তার অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। The Secret of the Golden Flower নামক গ্রন্থ এই প্রচেষ্টারই ফল। এ গ্রন্থ তিনি বিখ্যাত চীনাবিদ্ রিচার্ড উইলহেলমের সঙ্গে একত্রে রচনা করেন।

এবার আমরা তাঁর বৈশ্লেষিক মনোবিদ্যার প্রধান তথ্য ও তত্ত্বগুলি নিয়ে কিছু আলোচনা করব।

(এক)

মানস

ইয়ুং এর মতে মানস (Psyche) ভৌতসত্তা (Physical reality) থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক স্বনিয়ন্ত্রিত সত্তা। ভৌত-সত্তার মতো দর্শনীয় বা স্পর্শনীয় না হলেও অভিজ্ঞতা দ্বারা মানসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। মানস গতীয় প্রকৃতি। সমগ্র মানসকে নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞান এই দুই অংশে ভাগ করা হয়। অবশ্য নির্জ্ঞানই আদি সত্তা। নির্জ্ঞান থেকেই ক্রমশঃ সংজ্ঞানের আবির্ভাব। সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞানের প্রকৃতি বিভিন্ন হলেও একে অপরের পরিপূরক। সংজ্ঞানের পরিসর নির্জ্ঞান অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। সংজ্ঞানের কেন্দ্র হিসাবে জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্তারূপে সংজ্ঞানকে যে পরিচালনা করে তাকেই অহম্ (ego) বলা হয়। সংজ্ঞানের কেন্দ্ররূপে অহম্ বস্তুজগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। বিশাল সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপরিভাগ যেন অহম্। সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত অংশ যেন ব্যক্তি-নির্জ্ঞান (personal unconscious) এবং বিশাল অতলস্পর্শী সমুদ্র যেন জাতি-নির্জ্ঞান (racial unconscious)। ইয়ুং নির্জ্ঞানকে ব্যক্তি-নির্জ্ঞান ও জাতি-নির্জ্ঞান এই দুই অংশে ভাগ করেছেন। ব্যক্তি-নির্জ্ঞান যেন অহমের নিকট-প্রতিবেশী—তাদের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ি, মাখামাখি আছে। কিন্তু জাতি-নির্জ্ঞানের সঙ্গে সংজ্ঞানের বা অহমের ব্যবধান অনেকটা।

সংজ্ঞানে একই সঙ্গে অনেক বিষয় স্থান পায় না। অতীতে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে তার সবগুলি সম্বন্ধে একত্রে আমরা কখনই সজ্ঞান নই। তবু প্রয়োজন মতো তাদের দেখা পাই। অনেক ইচ্ছা বা চিন্তাকে অসামাজিক জ্ঞানে সংজ্ঞান (conscious) থেকে দূর করতে চাই। ফলে তাদের নির্বাসন ঘটে। আবার অনেক অনুভূতি, আবেগ বা সংবেদন সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট হয়ে সংজ্ঞাত হবার আগেই লুপ্ত হয়ে যায়। এরূপ অপরিণত অভিজ্ঞতা স্পষ্ট না হলেও মনে ছোঁয়াচ লাগায়। এ রকম সব বিষয়ই ব্যক্তি-নির্জ্ঞানের অধিবাসী ; অতীতের স্মৃতি, অবদমিত ইচ্ছা ও চিন্তা এবং অপরিণত অভিজ্ঞতা,'...forgotten,

repressed, subliminally perceived thought and felt matter of every kind', এরাই ব্যক্তি-নির্জ্ঞানের বিষয়বস্তু।

ব্যক্তি-নির্জ্ঞান প্রতি মানুষের স্বলব্ধ মানস-সত্তা। গঠন ও পরিবেশের ভিন্নতা অনুযায়ী প্রতি মানুষের ব্যক্তি-নির্জ্ঞানের বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র ও অনন্ত। কিন্তু জাতি-নির্জ্ঞান (racial unconscious) বা বা সমষ্টি-নির্জ্ঞান (collective unconscious) সকলের একই। জাতি-নির্জ্ঞান কারও নিজস্ব নয় ; এটা মানবজাতির কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সকল মানুষের সাধারণ মানস-সম্পদ। যুগযুগান্তরের মানুষের যে চিন্তাস্রোত তারই অবিচ্ছিন্ন ধারারূপে জাতি-নির্জ্ঞান প্রতি মানুষের মধ্যেই সমভাবে প্রবাহমান। ইয়ুং-এর মতে এই জাতি-নির্জ্ঞান নির্জ্ঞানের গভীরতর স্তর এবং জীবনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক্।

জাতি-নির্জ্ঞানের বিষয়বস্তু সকল মানুষে সমান। তারা হ'ল : সহজ প্রবৃত্তি (Instincts), প্রবৃত্তিজাত আবেগ, আধান (affect) ও নোদনা (drives)। এ ছাড়া থাকে কতকগুলি আদি-মানস-প্রকার (archetypes)। এগুলি যেন বিশেষ বস্তু, উপলক্ষ ও পরিবেশকে অভিজ্ঞতার সম্ভাব্য প্রকার। যুগযুগান্তর ধরে অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তির ফলে মনে যেন বিশেষ অভিজ্ঞতার জন্যে পথ কাটা হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের মানুষ যখন ঐ বিশেষ বিষয় ও পরিবেশের সম্মুখীন হবে, ঐ পূর্ব-নির্দিষ্ট মানস-পথেই তাদের অভিজ্ঞতা হবে। সূর্যের উদয় ও অস্ত, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বসন্ত ও শরতের আগমন, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে বৃষ্টির আবির্ভাব, জন্ম, মৃত্যু, পিতা, মাতা, খাদ্য ও সহচরী প্রাপ্তি, বিমাযুক্তি প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে প্রাচীন মানুষের যে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা সেগুলিই এই নির্দিষ্ট মানস-প্রকার সৃষ্টির সহায়তা করেছে। ইয়ুং-এর ভাষায় এগুলি হ'ল, "Pre-existent forms of apprehension or congenital conditions of intuition..... Just as the instincts compel man to a conduct of life that is specifically human, so the archetypes.....compel intuition and apprehension to forms specifically human."[১] যদিও এই অভিজ্ঞতা-প্রকারগুলি নির্জ্ঞানের অধিবাসী তবু বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে মানুষের অভিজ্ঞতায় এরা পরোক্ষে ধরা দেয়। মানুষ এদের আবেগ (emotion) ও প্রতিরূপ (image) হিসাবেই অভিজ্ঞতায় পেয়ে থাকে। যৌবনের আগমন, জীবনের সংকটময় কাল, প্রাকৃতিক বাধা উল্লঙ্ঘন, জন্ম ও মৃত্যু প্রভৃতি উপলক্ষ্যে আধুনিক মানুষের স্বপ্নে এরা পুরাণধর্মী প্রতিরূপের (mythical image) আকারে দেখা দেয়। আবার কয়েক প্রকার মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাস্তব-অভিজ্ঞতা-বর্জিত পৌরাণিক কল্পনার প্রাদুর্ভাব ঘটে। জাতি-নির্জ্ঞানের প্রভাব ছাড়া এ বিষয়ের অন্য কোন সদ্‌ব্যাখ্যাই দেওয়া যায় না। রোগীরা কোনও কোনও ক্ষেত্রে নানা অতিপ্রাকৃত দৃশ্য দেখে থাকে (vision) ও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় অভিভূত হয়। অনেক সময় এই অতিপ্রাকৃত দৃশ্য ও মনশ্চিত্রগুলি (fantasy) স্বয়ংক্রিয় ও অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বলে তাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। দর্শকরা তখন নিজেদের সম্পূর্ণ অসহায় মনে করে এবং ঐ অতিপ্রাকৃত চরিত্রের কাছে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে। তারই ইঙ্গিতে ওঠাবসা, চলা-ফেরা—তারই সাথে কথাবার্তা ও ভাব বিনিময় করে থাকে। আমরা সাধারণভাবে যাকে 'ভরকরা' বলি তা কতকটা এমনি ব্যাপার। জাতিনির্জ্ঞানের এই আদি-প্রকারগুলির (archetypes) প্রভাব জাতি ও ব্যক্তির জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এরা বক্রী হলে এককভাবে ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে সম্পূর্ণ উন্মাদ

১ Jung, Contributions to Analytical Psychology, P. 276.

হয়ে যেতে পারে অথবা সদয় হলে, শিল্প সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে। আবার সমষ্টির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার মারফত ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করতে পারে অথবা নবধর্ম রচনায় মানুষকে স্বর্গের পথে চালিত করতে পারে। ইয়ুং এদের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাই বলেছেন, "...the buried treasure from which mankind even and anon has drawn, and from which it has raised up its gods and demons and all those potent and almighty thoughts without which man ceases to be man".[২] আমাদের নানা লোককৃষ্টির মধ্যে এই আদি-প্রকারগুলির পরোক্ষ সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পুরাবৃত্ত, রূপকথা, গীত, গাঁথা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে নানা মূর্তরূপ পরিগ্রহ করে এদের আবির্ভাব ঘটে। এই লোকশিল্পগুলি জাতি নির্জ্ঞানের সৃষ্টি বলেই সকলদেশের পুরাবৃত্ত, রূপকথা ও ধর্মের দেবতা, উপদেবতাদের মধ্যে একটা মিল দেখা যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও ভূত, প্রেত, ডাইনী, পরী, তুকতাক প্রভৃতিতে বিশ্বাসের মধ্যে এই আদিম মানসতার পরিচয় মেলে।

জাতি-নির্জ্ঞানের পরিধি বা প্রকৃতি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তবু বিভিন্ন ব্যাপারে এর যেটুকু প্রকাশ ঘটে তাই পর্যবেক্ষণ করে এর সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়ার ইয়ুং বিশেষ চেষ্টা করেছেন। বহু স্বপ্ন, পুরাণধর্মী কল্পনা, পুরাবৃত্ত (myth), ইতিবৃত্ত ইত্যাদি বিশ্লেষণ ক'রে তিনি মানুষের জীবনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে জাতিনির্জ্ঞানস্থ এমনি কয়েকটি নির্দিষ্ট মানস-প্রকারের সন্ধান পেয়েছেন। সেগুলির তিনি নাম দিয়েছেন : ব্যক্ত-আমি (persona), গুপ্ত-আমি (shadow), পরিপূরক-নারী (anima), পরিপূরক-পুরুষ (animus), প্রবীণ প্রাজ্ঞজন (old wise man), মাতৃকা (great mother) ও আত্মন (self)।

সভ্যতার তাগিদে মানুষকে তার আদিম স্বভাবকে বহুলাংশে অবদমন করতে হয় এবং এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে হয়। এই নতুন রূপ হ'ল তার সভ্য, সামাজিক রূপ। এটি যেন একটি মুখোশ। এই মুখোশ পরে সে সমাজের কাছে এবং নিজের কাছে পরিচিত। মানুষের এই সামাজিক পরিচিতিকেই 'ব্যক্ত-আমি' (persona) বলা হয়। কিন্তু ব্যক্ত পরিচয়ের পিছনেও মানুষের এক অজ্ঞাত রূপ আছে। সমাজের মানদণ্ডে তা অসভ্য বা অধমরূপ। তাই সে রূপকে আড়াল ক'রে রাখা হয়। মানুষের এই অসামাজিক, অসংস্কৃত, অজ্ঞাত পরিচয়কেই বলা হয় 'গুপ্ত-আমি' (shadow)। ছায়া যেমন কায়ার নিত্য অনুগামী 'ব্যক্ত-আমি' ও 'গুপ্ত-আমি'র মধ্যেও তেমনি অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ছায়া যেমন ধরা ছোঁয়ার বাইরে, 'গুপ্ত-আমি' ও তেমনি সহজ পরিচয়ের আওতার বাইরে। স্বপ্নের মধ্যে বা শিল্পের মধ্যে এই দিকটিই রাক্ষস, দৈত্য বা দুরাত্মা (villain) হিসাবে দেখা দেয়। সেক্সপিয়রের 'ইয়াগো', 'ক্যালিব্যান' বা ষ্টিভেনসনের 'মিস্টার হাইড' এই 'গুপ্ত-আমির'-ই প্রক্ষিপ্ত শিল্পরূপ। তেমনি প্রতি পুরুষের মধ্যে এক নারী-প্রকৃতি ও নারীর মধ্যে পুরুষ-প্রকৃতি আছে। পুরুষের ঐ নারীরূপ এবং নারীর পুরুষরূপ ব্যক্তির কাছে সাধারণ-ভাবে অজ্ঞাত থাকে। এই নির্জ্ঞান নারী ও পুরুষ প্রকৃতি সংজ্ঞান পৌরুষ ও নারীত্বের পরিপূরক। তাই পুরুষের নারীরূপকে 'পরিপূরক নারী' ও নারীর পুরুষরূপকে 'পরিপূরক পুরুষ' বলা চলে। যুগযুগান্তর ধরে পুরুষের যে নারী ও নারীর পুরুষ সম্বন্ধে সাধারণ অভিজ্ঞতা, তারই সাথে একক পুরুষের নারী সম্বন্ধে ও নারীর পুরুষ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মিলিত হয়ে এই 'পরিপূরক নারী' (Anima) ও 'পরিপূরক পুরুষ' (Animus)-এর সৃষ্টি।

২ Jnng, Two Essays on Analytical Psychology, P. 68.

এ ছাড়া আছে 'প্রবীণ প্রাজ্ঞজন' ও 'মাতৃকা'। 'প্রবীণ প্রাজ্ঞজন' বিভিন্ন সময় সম্রাট, বীরপুরুষ, ধর্মস্থরী কিংবা ত্রাতা (saviour)-রূপে আবির্ভূত হয়। ব্যক্তির মধ্যে এই বিশেষ আদি-প্রকার জাগ্রত হলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। কারণ এই আদি-প্রকারের প্রচণ্ড শক্তির প্রভাবে ব্যক্তি নিজেকে অসীম শক্তির অধিকারী বলে বিশ্বাস করে বসতে পারে। সে নিজেকে মহাজ্ঞানী, যোগী, ঈশ্বরের অবতার বা ধর্মস্থরী ব'লে ভাবতে পারে। অনেক সময় ঐ আদি-প্রকারের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে বহু নরনারী তার অনুগামী হয়ে পড়ে। ব্যক্তি যখন বিশ্বাস করে যে এই মহাশক্তি তার সজ্ঞান মানসেরই অংশীভূত এবং তার করায়ত্ত তখনই অবশ্য বিপদ ঘটে। যেহেতু ঐ শক্তি জাতি-নির্জ্ঞানের অংশীভূত তাই ইচ্ছামত তাকে আয়ত্তে আনা যায় না। মূঢ় বিশ্বাসের দ্বারা ঐ শক্তিকে অন্ধভাবে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তার প্রচণ্ড ধমকে ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে উন্মাদ হয়ে যেতে পারে। পুরুষের বেলা যেমন 'প্রবীণ প্রাজ্ঞজন', স্ত্রীলোকের বেলা তেমনি 'মাতৃকা'র জাগরূপ বিপত্তি ঘটাতে পারে। কোন স্ত্রীলোকের মধ্যে ঐ 'মাতৃকা' জাগ্রত হলে সে নিজেকে মহাশক্তিরূপা বা সম্রাজ্ঞী, বিশ্বজননী ইত্যাদি বলে বিশ্বাস করে বসতে পারে এবং ঐ 'মাতৃকা'র অসীম শক্তিকে অন্ধ ব্যবহারের ফলে নিজেকে ধ্বংস করে বসতে পারে। তবে এদের যেমন মন্দ দিক আছে তেমনি ভাল দিকও আছে। যারা ঐ আদি-প্রকারগুলির ক্ষমতাবশে মোহান্ধ না হয়ে স্থির, শান্তভাবে যুক্তিবিচার দ্বারা ঐগুলির প্রকৃতি বোঝার যথার্থ চেষ্টা করে, তাদের আত্মিক উন্নতি ঘটে : "If a man believes he is voicing his own thoughts and experiencing his own powers, when really some idea is emerging from the unconscious, he is in danger of possession and of megalomania. ...If, however, the man can quietly 'listen' to the voiee of the unconscious and understand that the power works through him—he is not in control—then he is on the way to a genuine development of personality."[৩]

ইয়ুং-এর মতে নির্জ্ঞান ও সজ্ঞানের সুষ্ঠু সমন্বয়ের দ্বারাই সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হতে পারে। এই সম্পূরিত ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকেই তিনি 'আত্মন' (self) বলেছেন। সমগ্র সত্তা হিসাবে 'আত্মন' নানা আদি-প্রকারের মাধ্যমে ছন্দবেশে আত্ম প্রকাশ করে। 'সত্তার'-প্রতীকের মাধ্যমে 'আত্মন' খুব বেশী আত্ম প্রকাশ করে। এ ছাড়া ফুল, মণি-মাণিক্য, স্বর্ণগোলক, বৃত্ত বা চতুর্ভুজের সাহায্যেও 'আত্মন' সাংকেতিক-ভাবে আবির্ভূত হয়। ইয়ুং-এর মতে, শাস্ত্রোক্ত বিভিন্ন প্রকারের মণ্ডলাঙ্কন (Mandala) আত্মারই সাংকেতিক প্রকাশ। এই বিভিন্ন মণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দুতে একাগ্রভাবে অভিনিবেশের দ্বারা যৌগিক উপায়ে আত্মোপলব্ধিই এরূপ মণ্ডল সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

মানসিক রকম

ইয়ুং নির্জ্ঞান মানসের প্রকৃতি অনুধাবনের যেমন চেষ্টা করেছেন, সজ্ঞান মানস সম্বন্ধেও তেমনি নানা তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁর 'Psychological Types' নামক গ্রন্থে তিনি সজ্ঞান মনের প্রকৃতির দিক থেকে ব্যক্তির স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। মানসিক সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মূলে এক শক্তির প্রেরণা বর্তমান। সে শক্তিকে ইয়ুং বলেছেন, মনঃশক্তি (libido)। এই মনঃশক্তির গতিকে ভিত্তি

৩ Frieda Fordham, An Introduction to Jung's Psychology. (Pelican Book) P. 60.

করে তিনি মানুষকে দুইভাগে ভাগ করেছেন : অন্তর্বৃত (introvert) ও বহির্বৃত (extrovert)। যে ক্ষেত্রে মনঃশক্তি বাইরের জগতের প্রতি ধাবিত হয়ে বস্তুর উপর স্থাপিত হয় সে ক্ষেত্রে ব্যক্তি হয় বহির্বৃত। আর মনঃশক্তি বস্তুজগতের প্রতি বিরূপ হয়ে অন্তর্মুখী হয়ে নিজেরই উপর স্থাপিত হলে ব্যক্তি হয় অন্তর্বৃত। এই বিভাগ আসলে করা হয় মানুষের স্বাভী অভ্যাসকে (fixed habit) লক্ষ্য করে। এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছে যারা পরিস্থিতি দেখে যেন নিঃসঙ্কে 'না' বলেই সত্বর নিজেকে সেখান থেকে গুটিয়ে নেয় এবং পরে ভেবে চিন্তে পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার চেষ্টা করে। আবার কতকগুলি লোক আছে যারা পরিস্থিতি দেখামাত্র স্বতঃই বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরাই অন্তর্বৃত ও শেষোক্তরা বহির্বৃত। অন্তর্বৃতরা সাধারণভাবে নির্জনতাপ্রিয়, সংযতপ্রকৃতি ও সন্দেহবাদী হয়। তারা বস্তু অপেক্ষা ভাবের মধ্যেই মজে থাকতে পছন্দ করে এবং যুক্তি-বিচার ও হিসাব-নিকাশ করে তবেই কাজে হাত দেওয়ার পক্ষপাতী। অপর পক্ষে বহির্বৃতরা গোষ্ঠী মেলামেশায় উৎসাহী, জনতার নেতৃত্বে উৎসুক, উচ্ছল ও সক্রিয়। তারা ভাবনা অপেক্ষা বস্তুর মধ্যেই তৃপ্তি পায় এবং পরিণাম না খতিয়েই কাজে হাত দেওয়ার পক্ষপাতী। তারা দৃঢ় আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন ও আশাবাদী হয়।

অবশ্য কোন মানুষকেই চরম অন্তর্বৃত বা বহির্বৃত বলে চিহ্নিত করা যায় না। সংজ্ঞানে যে অন্তর্বৃত, নির্জ্ঞানে সে বহির্বৃত এবং সংজ্ঞানে যে বহির্বৃত নির্জ্ঞানে সে অন্তর্বৃত। নির্জ্ঞান এক্ষেত্রে সংজ্ঞানের পরিপূরকের কাজ করে। ইয়ুং তাই সাধারণ সকল মানুষকে এই দুই চরম রকমের এক মাঝামাঝি আপোষরফা বলে মনে করেন। এই রকমের নাম উভয়বৃত (ambivert)। অবশ্য বিভিন্ন মানুষের মধ্যে অন্তরমুখিতা বা বহির্মুখিতার প্রাধান্য অনুযায়ী আমরা সাধারণভাবে কাউকে অন্তর্বৃত, কাউকে বা বহির্বৃত বলে থাকি।

লিবিডোর গতি অনুযায়ী ব্যক্তির স্বরূপ নির্ধারণ ছাড়া ইয়ুং মানসিক ক্রিয়ার প্রাধান্য অনুযায়ীও মানুষকে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী। তাঁর মতে মানস-ক্রিয়া (mental function) প্রধানতঃ চার প্রকার : চিন্তা, অনুভূতি, সংবেদন ও অন্তর্দৃষ্টি। এই চার প্রকার মানস-ক্রিয়ার মধ্যে যে কোন একটি ব্যক্তির মধ্যে মুখ্য হয়ে দেখা দেয় এবং অপরগুলি গৌণভাবে কাজ করতে থাকে। ঐ মুখ্য ক্রিয়া অনুযায়ী ব্যক্তির রকম স্থির করা হয়। যার মধ্যে চিন্তার প্রাধান্য সে চিন্তাপ্রবণ (thinking type), যার মধ্যে অনুভূতির প্রাধান্য সে অনুভূতিপ্রবণ (feeling type), যার মধ্যে সংবেদন ক্রিয়ার প্রাধান্য সে সংবেদন-প্রবণ (sensing type) এবং যার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির প্রাধান্য সে অন্তর্দৃষ্টিপ্রবণ (intuitive type)।

চিন্তন হ'ল মনের বিচারবৃত্তি। সামান্য ধারণার সাহায্যে (concepts), যুক্তিতর্কের সাহায্যে বাস্তবকে বোঝা ও তার সাথে সম্পর্কিত হওয়া চিন্তনের বৈশিষ্ট্য। চিন্তাপ্রবণ ব্যক্তি তাই জগতকে প্রধানতঃ যুক্তি বিচার দিয়েই বুঝতে চাইবে। অনুভূতির কাজ আদর্শের নিরিখে বস্তুর মূল্য বিচার। ভাল বা মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর—এই মূল্যায়ন অনুভূতির কাজ। অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তিরা তাই বস্তুকে বস্তু হিসাবেই গ্রহণের চেয়ে তাদের মূল্যবিচারের পক্ষপাতী।

চিন্তন এবং অনুভূতি এই উভয় মানস-ক্রিয়াকেই ইয়ুং বৈচারিক (rational) মনে করেন। চিন্তনের মত, অনুভূতিও বিচারক্রিয়া। ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর নির্ণয় করা এ তো বিচার সাপেক্ষ। আদর্শের নিরিখে বস্তুর বা কর্মের মূল্যায়ণ—এ বিচার ছাড়া আর কি ? অপর পক্ষে সংবেদন এবং অন্তর্দৃষ্টি উভয়েই অবিচারী (irrational) মানস-ক্রিয়া। বিচার অপেক্ষা বাস্তব অনুভূতিই উভয় ক্রিয়ার লক্ষ্য।

সংবেদন দ্বারা বস্তুকে আমরা যথাযথরূপে জ্ঞাত হই। জল ঠাণ্ডা, মেঘ সাদা—এমনি সংবাদই আমাদের সংবেদন সরবরাহ করে। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারাও আমরা বাস্তব সম্বন্ধে অবহিত হই। কিন্তু সংবেদনের সাথে তার পার্থক্য আছে। সংবেদন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংজ্ঞান মনের অবহিতি আর অন্তর্দৃষ্টি নির্জ্ঞান মন দিয়ে সোজাসুজি বস্তুর অন্তরে ঢুকে তার সামগ্রিক রূপকে বা সমগ্র সম্ভাবনাকে জেনে ফেলা। যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দিকে ঝোঁক বেশী তাকে সংবেদন প্রবণ এবং যার মানসনেত্রের সাহায্যে সামগ্রিক জ্ঞানের প্রতি ঝোঁক তাকে অন্তর্দৃষ্টি প্রবণ বলা হয়। একটি উদাহরণ দিয়ে এই দুই ব্যক্তিরকমকে বোঝা যেতে পারে। যেমন, ঐতিহাসিক কোন ঘটনা। সংবেদন প্রবণ ব্যক্তি এর খুঁটিনাটি সমস্ত পৃথক পৃথক ভাবে লক্ষ্য করবে কিন্তু সমস্ত খুঁটিনাটির মধ্যে যোগাযোগ দ্বারা যে ঘটনাটির সামগ্রিক তাৎপর্য সেদিকে লক্ষ্য করবে না। অপর পক্ষে অন্তর্দৃষ্টি প্রবণ ব্যক্তি ঐ ঘটনাগুলির যোগসূত্র আবিষ্কারের দ্বারা একটি সামগ্রিক তাৎপর্য খুঁজতেই তৎপর হবে।

চিন্তন ও অনুভূতি পরস্পরের পরিপূরক। তেমনি সংবেদন এবং অন্তর্দৃষ্টিও পরস্পরের পরিপূরক। কোন এক ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ দাবিয়ে অপরটির প্রাধান্য ঘটলেই ব্যক্তিত্বের বিপর্যয় দেখা দেয়। যেমন কোন ব্যক্তি যদি অনুভূতিকে সম্পূর্ণ দাবিয়ে কেবল চিন্তনেরই সেবা করে তাহলে ঐ অবদমিত অনুভূতি সর্বদাই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে। ফলে অসতর্ক মুহূর্তে ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণ বুদ্ধি বিবেচনা হারিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে অসংলগ্ন ব্যবহার করে বসবে। এক্ষেত্রে সে অসহায়ভাবে আবেগের দাস হয়ে পড়বে। কাজেই স্বাভাবিক মানসিক অবস্থার পক্ষে পরিপূরক মানস-ক্রিয়াগুলির বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়।

অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে একটি মানস-ক্রিয়াই মুখ্য ক্রিয়া হিসাবে পরিণতি লাভ করে। আরও উন্নত ব্যক্তিদের পক্ষে দুই বা তিনটি ক্রিয়াও বিশেষ উন্নতির দ্বারা মুখ্যভাবে কাজ করতে পারে। আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিত্বে চারটি ক্রিয়াই সমানভাবে পরিণতি লাভ ক'রে মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। এরূপ ব্যক্তিত্বকে সম্পূরিত (integrated) ও সমগ্র ব্যক্তিত্ব বলা হয় : "If all the four functions could be raised into consciousness the whole circle would stand in the light and we could seek of a 'round' i. e. complete man."[৪]

অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত—এই দুই প্রতিষ্ঠাসিক রকম (attitudinal types) ও চার মানস-ক্রিয়া-প্রধান রকমকে (functional types) একত্রিত করে ইয়ুং সর্বসমেত আট প্রকার 'মানসিক রকমের' (Psychological Types) সৃষ্টি করেছেন। সেগুলি যথাক্রমে : অন্তর্বৃত চিন্তাপ্রবণ, অন্তর্বৃত অনুভূতি প্রবণ, অন্তর্বৃত সংবেদন প্রবণ ও অন্তর্বৃত অন্তর্দৃষ্টি প্রবণ। তেমনি, বহির্বৃত চিন্তা প্রবণ, বহির্বৃত অনুভূতি প্রবণ, বহির্বৃত সংবেদন প্রবণ ও বহির্বৃত অন্তর্দৃষ্টি প্রবণ।

আসলে কিন্তু কোন রকমকেই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে চরম রকম বলা চলে না। তাই সাধারণ মানুষকে 'মিশ্র রকম' (mixed type) বলেই গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃতির প্রাধান্য অনুযায়ী এক একজনকে বিশেষ রকমে চিহ্নিত করলেও তার মধ্যেও যে অন্যান্য পরিপূরক বৃত্তিগুলির প্রয়োজনীয় প্রভাব বর্তমান, সে কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা দরকার।

৪ Dr. Jolan Jacobi, The Psychology of C. G. Jung, Page 15.

লিবিডো

অবিরাম গতি চাঞ্চল্য মানসের বৈশিষ্ট্য। এই গতির মূলে এক শক্তির প্রেরণা বর্তমান। সে শক্তির মনস্তাত্ত্বিক নাম, লিবিডো। লিবিডো বলতে ইয়ুং বোঝেন, নির্বিশেষ মনঃশক্তি। তা ফ্রয়েডের 'কাম' বা অ্যাডলারের 'ক্ষমতাস্পৃহা'-র মত বিশেষ শক্তি নয়। এই নির্বিশেষ শক্তি সাধারণভাবে জীবন-সেবী। জীবনের প্রয়োজনে এ শক্তির কখনও পুষ্টি (nutrition), কখনও কাম (sex), কখনও বা ক্ষমতাস্পৃহা (will to power) বা অন্য কোন ভাবে প্রকাশ ঘটতে পারে। কিন্তু একান্তভাবে এর কোনটিই সে শক্তির পরিচয় নয়। পদার্থবিদ্যার শক্তি (energy) নির্বিশেষ ; তবু তাপ, আলোক, বা বিদ্যুৎরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু এর বিশেষ কোন প্রকাশকেই একান্তভাবে ঐ শক্তি বলা চলে না। মনঃশক্তির বেলাতেও সে কথা সমান সত্যি।

শক্তি হিসাবে লিবিডো সদাই ক্রিয়াচঞ্চল। বিরুদ্ধ দুই মানস-মেরুর (mental poles) মধ্যে এর চলাফেরা। মনে বিভিন্ন পর্যায়ের কয়েক প্রকার বিরোধী জোড় (opposites) বর্তমান। যেমন, অগ্রগমন (progression) ও পশ্চাদ্গমন (regression), নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞান, অন্তর্বৃত্ত ও বহির্বৃত্ত, চিন্তন ও অনুভূতি ইত্যাদি। লিবিডো ঐ জোড়ের চরম এক মেরুতে পৌঁছালে আবার তার বিপরীত মেরুর দিকে চলার প্রবণতাও দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায়, চরম রাগের পর প্রশান্তি ফিরে আসে, চরম ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রায়ই গভীর ভালবাসায় পরিণত হয়। এই শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখাই সমগ্র মানসের লক্ষ্য।

স্বপ্ন

ফ্রয়েডের মতো ইয়ুংও স্বপ্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ফ্রয়েডের মতো তিনিও মনে করেন যে স্বপ্ন অর্থপূর্ণ ব্যাপার এবং এর মারফত মনের গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাওয়া যায়। উভয়েই এ বিষয়ে একমত যে, স্বপ্ন ঘুমের মধ্যে প্রতীক ভাষায় মনের কথা বলা। কিন্তু এ পর্যন্ত একমত হলেও ইয়ুং স্বপ্নের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে মতামত দিয়েছেন তা ফ্রয়েডের মতের বিরোধী।

ফ্রয়েডের মতে, ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর স্বপ্ন বলে আমরা যা স্মরণ করি তা স্বপ্নের বহিরাবরণ (facade) মাত্র। এই বহিরাবরণের পিছনে থাকে স্বপ্নের আসল অর্থ। স্বপ্নের বহিরাবরণকে বলা হয়, ব্যক্ত অংশ (manifest content) ও অন্তর্নিহিত ভাবকে বলা হয়, অব্যক্ত অংশ (latent content)। এই ব্যক্ত অংশ অধিকাংশ সময়েই অর্থহীন বা আজগুবি বলে মনে হলেও অব্যক্ত অংশ বিশেষ অর্থপূর্ণ। সেই অব্যক্ত বিশেষ অংশকে গোপনের জন্যেই ব্যক্ত অংশের আজগুবি বা এলোমেলো রূপে প্রকাশ। স্বপ্নের অন্তর্নিহিত ভাবকে গোপন করার কারণ, স্বপ্নে আমাদের যে আশা, আকাঙ্ক্ষা বা প্রক্ষোভের প্রকাশ পায় তা নীতিবিগর্হিত। এই নীতিবিরুদ্ধ ইচ্ছাগুলিকে কল্পনায় ভোগ করাই স্বপ্নের উদ্দেশ্য। কিন্তু মনের মধ্যে এক নৈতিক প্রহরী (censor) থাকে, তার শাসনের দরুণ ঘুমের মধ্যেও ঐ ইচ্ছাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই খোলাখুলিভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। সেই কারণে, কতকগুলি বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঐ ইচ্ছাগুলি ছদ্মবেশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই ছদ্মবেশ গ্রহণ করাকেই বলা হয় স্বপ্নরচনা (dream work)। স্বপ্নরচনা ব্যাপারে যে বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যবহার হয় তাদের বলা হয়ঃ সংক্ষেপণ (condensation), অভিক্রান্তি (displacement), নাটন

(dramatisation) ও গৌণ অনুযোজনা (secondary elaboration)। স্বপ্নরচনা সম্পর্কিত প্রথম তিনটি ব্যাপার ঘটে নির্জ্ঞান মনে ও শেষোক্তটি ঘটে আসংজ্ঞানে (priconscious)।

ইচ্ছাপূরণই স্বপ্নের মূল কথা। এই ইচ্ছার অধিকাংশই যৌন ইচ্ছা। কিন্তু যৌন ইচ্ছা ছাড়াও আক্রম-ইচ্ছা বা অন্য কোন ইচ্ছাও স্বপ্নে প্রকাশ পেতে পারে। তবে ইচ্ছাগুলি অসামাজিক বা নীতি বিগর্হিত হওয়া চাই। এই ইচ্ছাগুলি নির্জ্ঞানে অবদমিত অতীত ইচ্ছা, অথবা প্রাত্যহিক জীবনের কোন অসমাপ্ত এবং অপূর্ণ চিন্তা ও ইচ্ছা। তবে বর্তমানের ইচ্ছা যদি অবদমিত ইচ্ছার সমগোত্রীয় হয় তবেই তারা অতীত ইচ্ছার সমর্থনে শক্তিশালী হয়ে স্বপ্নরচনা সম্ভব করে। কাজেই প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলীর যখন স্বপ্নে আবির্ভাব ঘটে, বুঝতে হবে, অবদমিত ইচ্ছার সহিত তাদের যোগাযোগ হয়েছে এবং তাদের শক্তি নিয়ে তবেই ঐ বর্তমানের স্বপ্নে আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। ফ্রয়েডের ভাষায়ঃ "The formation of dreams can be provoked in two different ways. Either, on the one hand, an instinctual impulse which is as a rule suppressed (that is, an unconscious wish) finds enough strength during sleep to make an impression upon the ego, or, on the other hand, a desire left over from waking life, a preconscious chain of thought with all the conflicting impulses belonging to it, obtains reinforcement, during sleep from an unconscious element."[৫]

স্বপ্ন তাই গতীয় প্রকৃতি (dynamic)। তার মধ্যে শক্তির খেলা। স্বপ্ন নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞান শক্তির দ্বন্দ্বের আপোষরফা (compromise-formation)। স্বপ্নের অর্থ বুঝতে হলে তাই ঐ শক্তির সন্ধান করতে হবে। এ শক্তি আসলে ইচ্ছা-শক্তি। ফ্রয়েডের মতে তাই স্বপ্নের অর্থ বুঝতে হলে স্বপ্নে ব্যবহৃত বিভিন্ন ছদ্মবেশকে উন্মোচন করে ইচ্ছাকে আবিষ্কার করতে হবে। এই ইচ্ছা আবিষ্কারের ব্যাপারে ব্যক্তির অবাধ ভাবানুষঙ্গ (free association) বিশেষ সাহায্য করে। অবাধ ভাবানুষঙ্গের সাহায্যে স্বপ্নের অন্তর্নিহিত অর্থকে আবিষ্কার করাকেই স্বপ্ন-বিশ্লেষণ (dream analysis) বলা হয়।

ইয়ুং ফ্রয়েড আবিষ্কৃত স্বপ্নরচনা পদ্ধতি (dream work) মানেন না। স্বপ্নের মধ্যে গোপনীয়তার যে স্থান আছে তাও ফ্রয়েডের মত স্বীকার করেন না। স্বপ্নে ফ্রয়েড যে নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞানের দ্বন্দ্ব দেখেছেন, ইয়ুং সে দ্বন্দ্বও মানেন না। তাঁর মতে, স্বপ্নে নির্জ্ঞান যেন সংজ্ঞানের সহায়তা (compensation) করে। দ্বন্দ্ব না মানার আরও কারণ এই যে, নীতি বিরোধী ইচ্ছার প্রকাশই যে স্বপ্নের বিষয়বস্তু একথার অস্বীকার। সেই কারণেই অতীতকে আশ্রয় করেই যে স্বপ্ন রচিত হয় তাও অস্বীকার করেন।

ইয়ুং মনে করেন, ফ্রয়েডের স্বপ্ন যান্ত্রিক কারণবাদ (mechanical course) অনুযায়ী রচিত, আর তাঁর স্বপ্ন উদ্দেশ্য কারণবাদ (tebological cause) অনুযায়ী রচিত। অর্থাৎ ইয়ুং-এর মতে স্বপ্ন সম্ভাবনা নির্দেশক (prospective function) ব্যাপার। তাই অতীতকে নিয়ে স্বপ্ন রচনা নয়। স্বপ্নের লক্ষ্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। আমাদের জীবনের নব নব সমস্যার সমাধান চাই। জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত মানুষ বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমুখীন হওয়ার জন্যে সংজ্ঞানে নানা চিন্তা করে থাকে। নির্জ্ঞান সংজ্ঞানের পরিপূরক হিসাবে ঐ বিষয়ে যে মাথা ঘামাবে তা স্বাভাবিক। তাই স্বপ্নের মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যা-সমাধান-মূলক নানা ইঙ্গিত দেখা দেয়। তিনি বলেছেন: "The activity of the cons-

৫ Freud, An outline of Psycho-analysis, P. 27.

ciousness, speaking logically, represents the psychological effort which the individual makes in adopting himself to the conditions of life. His consciousness endeavours to adjust itself to the necessities of the moment, or, to put it differentlly : there are tasks ahead of the individual, which he must overcome. Now we have no reasons for assuming that the unconscious follows other laws than those which apply to conscious thought. The unconscious, like the conscious, gathers itself about the biological problems and endeavours to find solutions for these by analogy with what has gone before, just as much as the conscious does."[৬]

স্বপ্নে প্রাপ্ত নির্জ্ঞানের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যক্তিত্বকে চালনা করলে জীবনে শুভ ফল পাওয়া যায়। অনেক সময় স্বপ্নে আসন্ন বিপদ আপদের কথাও জানতে পারা যায়। স্বপ্নে উচ্চারিত এই সতর্কবাণীকে গ্রহণ করলে অবশ্যম্ভাবী সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কেবল যে ব্যক্তির ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য তা নয়, জাতি বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে যেমন স্বপ্ন রচিত হয় গোষ্ঠীগত সমস্যা নিয়েও তেমনি স্বপ্ন রচিত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে রাজা বা দলপতির নিকট গোষ্ঠীর আসন্ন বিপদ আপদ বা সমৃদ্ধির কথা স্বপ্নের মাধ্যমে দেখা দিতে পারে। প্রাচীনকালে যে এরূপ ব্যাপার ঘটত তা পুরাবৃত্ত বা রূপকথা থেকে জানা যায়। দেখা যায়, রাজা স্বপ্নের নির্দেশ অনুযায়ী গোষ্ঠীর নিরাপত্তার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আজকের দিনে এসব কথা আজগুবি মনে হলেও তা বাস্তবিকই অসম্ভব নয়। ইয়ুং মনে করেন, জাতি-নির্জ্ঞানের প্রভাবে এরূপ গোষ্ঠীসম্পর্কিত স্বপ্ন সম্ভব। সমস্যার রকম অনুযায়ী তাই তিনি স্বপ্নকে জাতিগত (collective dream) ও ব্যক্তিগত (personal dream)—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

তবে ইয়ুং মনে করেন স্বপ্নকে কোন বিশেষ এক সূত্র দিয়ে বাঁধা সম্ভব নয়। অর্থাৎ স্বপ্নের ক্ষেত্র অতি ব্যাপক। জীবনের সমস্যামূলক নির্দেশই স্বপ্নের একমাত্র বিষয়বস্তু নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবদমিত ইচ্ছাও স্বপ্নে দেখা দিতে পারে। আবার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ও দেখা দিতে পারে: "It is certainly true that there are dreams which embody suppresscd wishes and fears, but what is there which the dream can not on occasion embody? Dreams may give expression to ineluctable truths, to philosophical pronouncements, illusions, wild fantasies, memories, plans, anticipations, irrational experiences, even telepathic visions, and heaven knows what besides."[৭]

ইয়ুং তাই ফ্রয়েডের স্বপ্নব্যাখ্যা (dream interpretation) পদ্ধতির পক্ষপাতী নন। ফ্রয়েডের পদ্ধতি বিশ্লেষাত্মক (analytic) এবং তাঁর পদ্ধতি সংশ্লেষাত্মক (synthetic)। তাঁর মতে, বিশ্লেষণ পদ্ধতি দ্বারা স্বপ্নকে কেটেছিঁড়ে তার অতীত কারণ বার করা অপ্রয়োজনীয়। তিনি মনে করেন, ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে শৈশবের যৌন ইচ্ছাগুলিকে বার করে সেগুলিকে বার করে সেগুলি ব্যক্তির কাছে

৬ Collected Papers on Analytical Psychology, P. 222-23

৭ Jung, Modern Man In search of a Soul, p. 13

উপস্থিত করিলে তাতে ব্যক্তিত্বের ক্ষতিই হয়। কারণ, ঐ আদিম অবস্থা অতিক্রম করে ব্যক্তি সভ্যতার পথে চলেছে। কাজেই অতীত আদিম অবস্থায় ঠেলে নিয়ে গেলে ব্যক্তির অধঃপতন ঘটারই সম্ভাবনা। তাই স্বপ্নের মধ্যে দেখতে হবে, জীবনে অগ্রগতির পথে চলার পক্ষে কি প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়া যায়। ইয়ুং-এর ভাষায়: "The patient's salvation is not to be found by thrusting him back again into primitive sexuality; this would leave him on a low plane of civilization whence he could never obtain freedom and complete restoration to health. Retrogression to a state of barbarism is no advantage at all for a civilised human being"[৮]

ইয়ুং-এর স্বপ্নব্যাখ্যা পদ্ধতি তাই বিভিন্ন। ফ্রয়েডের লঘুকরণাত্মক (reductive method) পদ্ধতির দ্বারা নির্ব্বানস্থ যৌন ইচ্ছাগুলি না খুঁড়ে, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ স্বপ্নের নির্দেশটি কি খুঁজে বার করার চেষ্টা। নির্জ্ঞান সংজ্ঞানের পরিপূরক (compensatory)। তাই স্বপ্নের মাধ্যমে নির্জ্ঞান সংজ্ঞানকে কি ভাবে সম্পূর্ণ করছে তা দেখতে হবে। স্বপ্ন ব্যাখ্যার ব্যাপারে সংজ্ঞানকে বাদ দিয়ে কেবল নির্জ্ঞানকেই প্রাধান্য দিলে তা অর্থহীন একতরফা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই স্বপ্নকে বুঝতে হলে সংজ্ঞানের বিশেষ সহায়তা নিতে হবে। স্বপ্নকে বুঝতে হলে সমসাময়িক পরিস্থিতিকে (context) সম্পূর্ণভাবে জানতে হবে এবং স্বপ্নসম্পর্কিত সংজ্ঞানের অন্যান্য ভাব, ধারণা বা চিন্তা স্বপ্নদ্রষ্টার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এ ব্যাপারের জন্যে ফ্রয়েড ব্যবহৃত অবাধভাবানুষঙ্গের ব্যবহার ইয়ুং সঙ্গত মনে করেন না। তিনি তাই সম্প্রসারণ পদ্ধতি (amplification) সাহায্যে ব্যক্তির কাছ থেকে স্বপ্নবিষয়ক খবর সংগ্রহের চেষ্টা করেন। এই পদ্ধতিতে, চিকিৎসক স্বপ্নের বিভিন্ন বিষয় দ্রষ্টাকে দিয়ে, সে সম্বন্ধে তার কি কি মনে হয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে খবর সংগ্রহ করেন। ফলে একে আর অবাধ ভাবানুষঙ্গ বলা চলে না।, কারণ, এখানে খবর সংগ্রহ চলে চিকিৎসকের পরিচালনায় (directed)। এরপর ঐ বিষয়গুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে অর্থ আবিষ্কার করা হয়। সে অর্থ আবার স্বপ্নদ্রষ্টার সমর্থন সাপেক্ষ। স্বপ্নের আবিষ্কৃত অর্থ যথাযথ বলে দ্রষ্টা কর্তৃক উপলব্ধ হলে তবেই স্বপ্ন ব্যাখ্যার সার্থকতা। কারণ অর্থোদ্ধার দ্বারা ব্যক্তির সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞানের সমন্বয় (assimilation) সাধনই এই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য।

স্বপ্নে ব্যবহৃত প্রতীকের (symbol) অর্থ উদ্ধার করতেও তাই স্বপ্ন দ্রষ্টার দার্শনিক, নৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য দিতে হবে। স্বপ্নে ব্যবহৃত প্রতীকগুলি মোটেই সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় অর্থজ্ঞাপক নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। স্বপ্নে দৃষ্ট কোন কোন প্রতীকের অর্থ উদ্ধারের জন্যে পুরাবৃত্ত ও রূপকথার সাহায্যও নিতে হতে পারে। বিভিন্ন পুরাবৃত্ত ও রূপকথায় ঐ প্রতীক কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা জেনে সেই আলোকে স্বপ্নের প্রতীকের অর্থ উদ্ধার প্রয়োজনমত করা হয়। এইভাবে ইয়ুং-এর স্বকীয় পদ্ধতিতে স্বপ্নব্যাখ্যা চলে। ফ্রয়েড থেকে এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

উদ্ধায়ু

মানসিক রোগের কারণ সম্পর্কেও ফ্রয়েড ও ইয়ুং-এর মধ্যে মতভেদ আছে। ফ্রয়েডের মতে শৈশবের যৌন ইচ্ছার বিশৃঙ্খলাই উদ্ধায়ুর (neurosis-এর) কারণ। কামের (libido) বিকাশের

৮ Jung, Collected Papers on Analytical Psycholgy p. 221

বিভিন্ন পর্যায়ে কোনও কামনাকে শিশু ভুল বুঝে বা ভয় পেয়ে এড়িয়ে গেলে তা অতৃপ্ত থেকে যায়। ক্রমশঃ ঐ ইচ্ছা মনের গভীরে অবদমিত হয়। কিন্তু ঐ ইচ্ছা যদি যথেষ্ট শক্তিশালী হয় তাহলে তা সর্বদাই সংজ্ঞান মনে চড়াও হয়ে তৃপ্তির চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যক্তির নীতিজ্ঞান বা সমাজবোধের দরুণ সংজ্ঞান মন ঐ ইচ্ছাকে নির্জ্ঞানে ঠেলে দেয়। এইরূপে নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞানের দ্বন্দ্ব বাধে। তখন স্বপ্ন রচনার মতই নির্জ্ঞানের ঐ ইচ্ছাগুলি গোপনীয়তার আশ্রয় নেয়। তারা তখন নানা মানসিক ও দৈহিক রোগ লক্ষণের (symptoms) সৃষ্টি ক'রে সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করে। এই লক্ষণগুলিও স্বপ্নের ব্যক্তঅংশের (manifest content) মতই অবদমিত ইচ্ছার ছদ্মপ্রকাশ। কাজেই ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করতে হলে রোগলক্ষণের অন্তর্নিহিত অর্থগুলি খুঁজে বার করতে হয়। রোগীর জীবন-বিবরণী (life history), স্বপ্ন ও অবাধ-ভাবানুষঙ্গ এ বিষয় সাহায্য করে। এদের সাহায্যে অবদমিত ইচ্ছাগুলির সন্ধান পাওয়া গেলে রোগীকে কল্পনায় পুনরায় ঐ শৈশবে ফিরে গিয়ে কামনাগুলি কল্পনাসাহায্যে ভোগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। বাস্তবের উপলব্ধি ও কাল্পনিক ভোগের সাথে সাথে ব্যক্তি রোগমুক্ত হয়ে ওঠে। কাজেই ফ্রয়েডের মতে বাসনার অতৃপ্তি ও সংঘাত যেমন রোগের কারণ, তেমনি, বাসনার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন ও ভোগতৃপ্তিই উপশমের উপায়।

ইয়ুং মনে করেন, রোগীর অতীত জীবনে অর্থাৎ শৈশবে নয়, বর্তমানেই উদ্বায়ুর কারণ নিহিত। আর বাসনার অতৃপ্তিই রোগের কারণ নয়। জীবনসংগ্রামে পরাজয়ই তার কারণ। ব্যক্তি সর্বদাই বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ার চেষ্টা করছে। বাস্তবের বিভিন্ন সমস্যা তাকে সমাধান করতে হচ্ছে। কিন্তু কোনও সমস্যার সমাধান যদি তার সামর্থে না কুলায় তখন তার লিবিডো বাস্তব থেকে সরে ব্যক্তির শৈশবাবস্থায় প্রত্যাবৃত্তি (regression) করে। ফলে ব্যক্তি বাস্তবের সম্মুখে এলোমেলো আচরণ করতে থাকে। এমনি অবস্থায় উদ্বায়ু দেখা দেয়। ইয়ুং তাই বলেছেন: "Therefore I no longer find the cause of a neurosis in the past, but in the present. I ask, what is the necessary task which the patient will not accomplish ?"[৯]

কিন্তু ইয়ুং আবার এও বলেন যে, বাস্তব সমস্যাই উদ্বায়ুর একমাত্র কারণ নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে এ রোগ দেখা দিতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে যৌন ইচ্ছার বিশৃঙ্খলার দরুণও উদ্বায়ু হতে পারে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে, অস্বাভাবিক ক্ষমতাস্পৃহা (will to power) – আড্‌লারের মতবাদ—কারণ হতে পারে। কিন্তু এই প্রবৃত্তিক কারণ ছাড়াও, জীবনে আধ্যাত্মিকতার অভাববোধও উদ্বায়ুর কারণরূপে দেখা দিতে পারে। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে যে-উদ্বায়ু দেখা দেয়, তাদের কারণ হিসাবে বাস্তব সমস্যা, অতৃপ্ত যৌন ইচ্ছা বা অস্বাভাবিক ক্ষমতাস্পৃহা বর্তমান থাকে। কিন্তু চল্লিশের পর এদের প্রভাব কমে যায়। তখন রোগ দেখা দিলে বুঝতে হবে জীবনে ধর্মীয় প্রভাব বা আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন ঘটেছে।

ইয়ুং-এর মতে উদ্বায়ু ব্যাধি হলেও তার ভাবাত্মক মূল্য আছে। স্বপ্নের মতো উদ্বায়ুও সম্ভাবনা নির্দেশক (Prospective)। তিনি মনে করেন, উদ্বায়ুর মধ্যে অন্তরাত্মার মুক্তি ও পূর্ণতা লাভের আকুতি শোনা যায়। এ মানস-অবস্থার মাধ্যমে যেন আমরা সচেতন হয়ে উঠি যে, আমাদের মধ্যে যে অপূর্ণতা রয়েছে তা অতিক্রম ক'রে পূর্ণতা লাভের প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে: "The symptoms

৯ Jung, Collected Papers, P. 232

of neurosis are not simply the effects of long past causes, whether infantile sexuality or the infantile urge to power, they are also attempts at a new synthesis of life—unsuccessful attempts let it be added—yet attemts nevertheless, with a core of value and meaning."[১০] ইয়ুং-এর ব্যাখ্যাকার জেকবী বলেছেন: "So can the neurosis become, according to circumstances, the stimulus to the struggle for the wholeness of the personality, which is for Jung at once task and goal and the greatest boon granted upon earth to man—a goal independent of any medico-therapeutic viewpoint."[১১]

উদ্বায়ু রোগের চিকিৎসা ব্যাপারেও ফ্রয়েড ও ইয়ুং-এর মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। ইয়ুং-এর মতে রোগের কারণ যেমন বিভিন্ন তার চিকিৎসাও তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে বাধ্য। যেখানে কারণ হিসাবে যৌন ইচ্ছার দ্বন্দ্ব দেখা যাবে, সেখানে ফ্রয়েডীয় মতেই চিকিৎসা চলবে। যে-ক্ষেত্রে বর্তমানের বাস্তবসমস্যা রোগ সৃষ্টি করবে সে-ক্ষেত্রে রোগীকে সমস্যার সম্মুখীন হবার উপযোগী মানসিক উপকরণ যোগাতে হবে। এই দুই জাতীয় উদ্বায়ু সাধারণতঃ যুবক-যুবতীদের মধ্যে দেখা যায়। তৃতীয় প্রকার উদ্বায়ু এবং তার চিকিৎসাই ইয়ুং-এর বিশেষ আবিষ্কার। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তিনি দেখেছেন, কোনও কোনও ব্যক্তি জীবনে বেশ সাফল্য অর্জন ক'রে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়েছেন কিন্তু চল্লিশের কাছাকাছি এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। জীবনকে যেন আর টেনে নিয়ে যেতে পারছে না। আবার কোনও কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখেছেন, তারা মধ্য-বয়সে পৌঁছেই জীবনে কেমন একটা শূন্যতা ও অপূর্ণতা বোধ করেন। এদের বিশেষভাবে রোগী না ব'লে, এই 'শূন্যতাবোধকে' ইয়ুং এই যুগেরই মানসিক ব্যধি ('general neurosis of our times') বলেছেন। এই সব মধ্য-বয়সীদের মনোচিকিৎসার জন্যে প্রয়োজন আত্মার পরিপূর্ণতা। কেবল জৈবিক তাগিদের তৃপ্তির দ্বারা এসব ক্ষেত্রে মুক্তি আসিবে না। এদের প্রয়োজন ধর্ম, নীতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব। এসব ক্ষেত্রে বিশেষ যে চিকিৎসা তার নাম আত্মায়ণ (Individuation)। জাতি-নির্জ্ঞানে যে আদি-মানস-প্রকার রয়েছে, একের পর এক তাদের জাগ্রত ক'রে তাদের প্রভাব জীবনে উপলব্ধি করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় শেষ যে মানস-প্রকারের জাগরণ ঘটে তা হল, আত্মন (self)। এই আত্মনকে উপলব্ধি দ্বারাই ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা লাভ হয়। এই আত্মায়ণ প্রক্রিয়াকে ইয়ুং প্রাচ্যের যোগাভ্যাসের সঙ্গে অনেক সময় তুলনা করেছেন। এই প্রক্রিয়াকে ঠিক চিকিৎসা বলা চলে না। এ আসলে আত্মোপলব্ধি (self-realisation)। মানুষের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা সুপ্ত রয়েছে এই প্রচেষ্টার ফলে তার উত্থান ঘটে এবং মানুষ সমগ্র বিশ্বের সাথে ও ঈশ্বরের সাথে একাত্মবোধ করে। জেকবী আত্মায়ণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বলেছেন: "It is, therefore, as a way to self-knowledge and self-control, as an activation of the ethical function, by no means limited to sickness or neurosis. Offen, truly, a sickness provides the impulse to take this way, but quite as often it is the longing to find a meaning in life, to restore one's faith in God and in one's self…"[১২]

১০ Jung, Two Essays on Analytical Psychology, P. 45
১১ Jacobi, The Psychology of C. G. Jung, P. 98
১২ Jacobi, The Psychology of C G. Jung, P. 125

কেবল মুষ্টিমেয় রোগীর ক্ষেত্রে নয়, এযুগের মানুষ, যারা ধর্ম, নীতি, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি মূল্যবোধ হারিয়ে বিভীষিকা ও বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়েছে তাদের সকলের জন্যে তিনি এই আত্মিকচর্চা মুক্তির উপায় বলে মনে করেন।

(দুই)

ইয়ুং-এর ভক্তদের মতে, তাঁর চিন্তা ফ্রয়েডের চিন্তার অনেক উর্ধ্বে গেছে এবং তিনি ফ্রয়েডের চেয়ে উন্নততর মনোবিদ্যার সৃষ্টি করেছেন। এ দাবীর সত্যতা নিরূপিত হতে পারে একমাত্র উভয়ের প্রধান মতামতগুলির তুলনামূলক বিচারের দ্বারা। এ প্রবন্ধে অবশ্য সে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নাই। তবু সংক্ষেপে প্রধান কয়েকটি বিষয় আলোচনা করে দেখা যেতে পারে ইয়ুং সত্যিই ফ্রয়েড অপেক্ষা কত উর্দ্ধে গেছেন।

ইয়ুং মনে করেন স্তরীয় মনোবিদ্যা (depth Psychology) বলতে তাঁর মনোবিদ্যাকেই বোঝায়। কারণ, তিনিই যথার্থ নির্জ্ঞান মনের সন্ধান দিয়েছেন। ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান মন তাঁর নির্জ্ঞান অপেক্ষা অনেক কম গভীর (deep) ও গতীয় (dynamic)। ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান তো কেবল ব্যক্তি জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ নির্জ্ঞান, ব্যক্তি মনের আবর্জনার আস্তাকুঁড়। জীবনের অবদমিত অসামাজিক ইচ্ছাপুঞ্জ ছাড়া আদিম জীবনধারার কোনও গতিচাঞ্চল্য বা বল (force) এর মধ্যে নেই। অথচ তাঁর জাতিনির্জ্ঞান এ বিষয়ে কত সমৃদ্ধ!

ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান সম্বন্ধে এ হ'ল ইয়ুং-এর ব্যক্তিগত অভিমত। ফ্রয়েড নির্জ্ঞান বলতে কেবল ব্যক্তি জীবনের অবদমিত ইচ্ছাপুঞ্জকেই মেনেছেন অথবা অন্যকিছুও মেনেছেন তাঁর লেখা থেকেই সে বিষয় প্রমাণিত হওয়া উচিত। তিনি লিখেছেন: "originally, of course, everything was id, the ego was developed out of the id by the continued influence of the external world. In the course of this slow development certain material in the id was transformed into the preconscious condition and was thus taken into the ego. Other material remained unaltered in the id, as its *hardly accessible nucleus.* But during this development the young and feeble ego dropped and pushed back into the unconscious condition certain material which it had already taken in, and behave similarly in regard to many new impressions which it might have taken in, so that these were rejected and were able to leave traces in the id only. In consideration of its origin, we term this portion of the id the *repressed.*"[১৩]

কাজেই একথা সুস্পষ্ট যে, ফ্রয়েড কেবল ব্যক্তি জীবনের অবদমিত মানস-সামগ্রীকেই নির্জ্ঞান বলেননি, অদসের (id) মধ্যে যে 'hardly accessible nucleus' রয়েছে তা আসলে জন্মগত মানস-সামগ্রী হিসাবে আদি ও অকৃত্রিম নির্জ্ঞান। তাঁর অপর উক্তিতে উভয়বিধ নির্জ্ঞান সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট প্রমাণ আছে: "The study of dream-work affords us an excellent example of the

১৩ Freud, An outline of Psycho-analysis, PP.23-24.

way in which unconscious material from the id—*originally unconscious* and *repressed unconscious* alike—forces itself upon the ego, becomes Preconscious and, owing to the efforts of the ego, undergoes the modificatons which we call dream-distortion."[১৪] দুটি বিভাগ যে নির্জ্ঞানের মধ্যে ফ্রয়েড মেনেছেন, এ উক্তিতে তার জলন্ত প্রমাণ। এই 'originally unconscious'-এর স্বরূপ কি তা তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন এই উক্তিতে: "Beyond this, dreams bring to light material which could not originate either from the dreamer's adult life or from his forgotten childhood. We are obliged to regard it as part of the *archaic heritage* which a child brings with him into the world, before any experience of his own, as a result of the expriences of his ancestors. We find elements corresponding to this phylogenetic material in the earliest human legends and in surviving customs."[১৫]

যে জাতি-নির্জ্ঞান ও তার আদিম (archaic heritage) নিয়ে ইয়ুং-এর এত গর্ব ফ্রয়েডও যে আগে থেকেই তার সন্ধান রাখেন একথা সুস্পষ্ট। ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান যে কেবল ইয়ুং-এর বর্ণনামাফিক 'অবদমিত ইচ্ছার আস্তাকুঁড়' নয়, তার মধ্যে যে আদিম মানসও বর্তমান সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকা উচিত কি? ইয়ুং কিন্তু ফ্রয়েডের এই বক্তব্যগুলির দিকে একেবারেই দৃষ্টি না দিয়ে নিজের খুসীমাফিক ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করে ফ্রয়েডের চেয়ে নিজের শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তিনি নিজের মনোবিদ্যায় যাকে ব্যক্তি-নির্জ্ঞান বলেছেন তা আসলে— 'ফ্রয়েডীয় আসংজ্ঞান (preconscious)—অবদমিত মানস-সামগ্রী (repressed materials)'। এই দুইকে একত্রিত করে এই মিশ্রণকে তিনি ফ্রয়েডের সমগ্র নির্জ্ঞান বলে চালিয়েছেন এবং ফ্রয়েড স্বীকৃত 'originally unconscious' বা 'archaic heritage' থেকে ফ্রয়েডকে বঞ্চিত ক'রে সেটাকে নিজের অভিনব আবিষ্কার বলে প্রচার করেছেন। ফ্রয়েডের এই অপব্যাখ্যার দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে তিনি নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন—এ ছাড়া কি বলা যেতে পারে? এ বিষয়ে এডওয়ার্ড গ্লোভারের সতর্কবাণী বিশেষ স্মরণীয়: "……it is clear that the popular view according to which Jung's unconscious system is somehow broader or deeper than that of Freud is entirely fanciful. The concept of the dynamic unconscious originally advanced by Freud has been split up by Jung. One part has been assigned to a new container and branded with Jung's trade mark—the 'Collective Uncs.' Another has been dissociated, reduced in dynamic significance and allocated to the personal unconscions. This latter superficial and mainly Pre-conscious Jungian system is, however, represented as being Freud's whole stock-in-trade and returned to him labelled, in a way calculated to mislead the uniformed."[১৬]

লিবিডোর স্বরূপ নিয়েও ফ্রয়েডের সাথে ইয়ুং-এর মতভেদ। এ বিষয়েও ইয়ুং মনে করেন,

১৪ Freud, An outline of Psycho-analysis, P. 27.
১৫ Freud, An outline of Psycho-anlysis, P. 28.
১৬ Edward Glover, Freud or Jung, P. 25.

লিবিডো সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ফ্রয়েড অপেক্ষা অনেক ব্যাপক ও উন্নত। ফ্রয়েড লিবিডো বলতে 'কাম' বুঝেছেন আর ইয়ুং বুঝেছেন, জীবনসেবী নির্বিশেষ মনঃশক্তি। তাঁর মতে লিবিডোকে কামে (sexuality) পর্যবসিত করা চলে না। কারণ, শিশুর মধ্যে লিবিডোর প্রকাশ আছে পুষ্টি গ্রহণ (nutrition) ক্রিয়ায়, কিন্তু এর মধ্যে কামের নামগন্ধ নাই। শিশুর আবার কাম কি? ইয়ুং বলেছেন, "From a broader standpoint libido can be understood as vital energy in general, or as Bergson's elan vital. The first manifestation of this energy in the suckling is the instinct of nutrition. From this stage the libido slowly develops through mainfold varieties of the act of sucking into the sexual function. Hence I do not consider the act of sucking as a sexual act. The pleasure in sucking can certainly not be considered as sexual pleasure, but as *pleasure of nutrition*, for it is nowhere proved that pleasure is sexual in itself."[১৭]

কিন্তু সত্যিই কি শিশুর স্তন্যপানের মধ্যে কেবল পুষ্টি গ্রহণেরই আরাম আছে? তাই যদি হয় তাহলে শিশু শুরু স্তন পান করে কেন? আঙুল চোষে কেন? আঙুলের মধ্যে কোন পুষ্টি আছে? শিশুকে আঙুল চোষা ছাড়ান যে কি কঠিন ব্যাপার সে অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। আঙুল চোষার মধ্যে পুষ্টি ছাড়াও যদি কেবল চোষার আরাম কিছু না থাকবে তবে আঙুল চুষতে শিশুর এত জেদ কেন? শিশুর এই মুখের ঘর্ষণজাত আরামকেই ফ্রয়েড শিশুর জীবনে বস্তুীয় কামের (oral libido) প্রকাশ বলেছেন। কামের এই ব্যাপক স্বরূপটি ইয়ুং একেবারেই ধরতে পারেন নি। তাই তিনি ফ্রয়েডের কামতত্ত্বকে বিদ্রূপ করে বলেছেন : "As a matter of fact, Freud's concept of sexuality is thoroughly elastic, and so *vague* that it can be made to include almost anything. The word itself is familiar, but what it denotes amounts to an indeterminable or variable X that stands for the physiological activity of the glands at one extreme and the highest reaches of the spirit at the other"[১৮]

অর্থাৎ শৈশিক সম্পর্ক ছাড়া যেন কামের প্রকাশ হতে পারে না, ইয়ুং-এর এই বক্তব্য। তাহলে কি চুম্বন কামক্রিয়া নয়? নরনারীর চুম্বনের মধ্যে যে সুখ তা কি যৌনসুখ নয়? যদি তা না হয় তবে স্ত্রীপুরুষ যৌনবিহারের সময় চুম্বন করে কেন? অথচ চুম্বনের মধ্যে শিশ্নের কোন ছোঁয়াচ নাই। তাহলে কেবল মুখের স্পর্শের মধ্যেই যে যৌন আরাম পাওয়া যেতে পারে, চুম্বন একথাই প্রমাণ করে। অতএব কামের ব্যাপকতার মধ্যে সত্যিই 'vagueness' কিছু আছে কি? ইয়ুং-এর বিদ্রূপের তবে মূল্য কি?

ইয়ুং-এর মতে মানসিক গঠনের দিক থেকে প্রতি মানুষের মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই বর্তমান। পুরুষের মধ্যে এক অজ্ঞাত নারী আছে এবং নারীর মধ্যে পুরুষ আছে। এই নির্জ্ঞান নারী, পুরুষের সংজ্ঞান পৌরুষের পরিপূরক, আর নির্জ্ঞান পুরুষ, নারীর সংজ্ঞান নারীত্বের পরিপূরক।

কিন্তু মানুষের এই উভকামী (bisexual) স্বভাবের পরিচয় ফ্রয়েড আগেই দিয়েছেন এবং তাঁর মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার এটি একটি প্রধান বিষয়। তাঁর মতে, ".....all human individuals, as a result of their bi-sexual disposition and cross-inheritance, combine in themselves both masculine and feminine characteristics, so that pure masculinity and femininity remain theoretical constructions of uncertain content."[১৯] কাজেই মনস্তাত্ত্বিক তথ্যটি ইয়ুং-এর আবিষ্কার মোটেই নয়। তিনি কেবল 'Bisexuality' কথাটির পরিবর্তে দুটি নতুন নাম ব্যবহার করেছেন, anima ও animaus। আর করার মধ্যে করেছেন এই যে, ফ্রয়েড এই দ্বৈত প্রকৃতিকে মানুষের জীবনে যেমন জীবন্ত ও মূর্ত সত্যরূপে দেখেছিলেন, ইয়ুং তাকে অশরীরী ছায়ারূপে দেখেছেন। তাঁর মতে এই anima ও animus আসলে জাতি-নির্জ্ঞানের আদি-রূপ (arche-type)। আর আদি-রূপ বলেই এরা সামান্যগুণ বিশিষ্ট। অর্থাৎ এরা বিশেষ নারী ও পুরুষ প্রকৃতি নয়, সাধারণ নারী প্রকৃতি বা সাধারণ পুরুষ প্রকৃতি। কিন্তু অভিজ্ঞতায় যাকে পাই তা বিশেষ ছাড়া সামান্য হবে কি করে? যে পুরুষ তার অভিজ্ঞতার নারীত্বকে অনুভব করছে, সেই নারীত্ব "সাধারণ নারীস্বভাব" হয় কি করে? বিশেষ বিষয় ছাড়া সাধারণ বা সামান্যকে কি অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায়? এই অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে অবশ্য দার্শনিকরা অভিজ্ঞান প্রান্তপকরণরূপে সামান্য ধারণার উপস্থিতির কথা বলেন। কিন্তু সে ত তত্ত্ব। বাস্তব অভিজ্ঞতায় যা পাই তা বিশেষকেই পাই, সামান্যকে নয়। মনোবিদ্যা যেহেতু মূর্ত বিষয় নিয়ে কারবার করে তাই অভিজ্ঞতাকে বাস্তব ঘটনা হিসাবেই দেখতে হবে, তা অমূর্ত তত্ত্ব হিসাবে নয়। তাই বলা যেতে পারে যে, ইয়ুং anima ও animus-কে আদি-প্রকার বলে গণ্য করে ফ্রয়েডীয় মূর্ত তথ্যকে প্রাণহীন অমূর্ত তত্ত্বে পরিণত করেছেন।

ইয়ুং-এর মতে স্বপ্ন নির্জ্ঞান মনের সৃষ্টি এবং তা বর্তমান বা ভবিষ্যত জীবনসমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত। নির্জ্ঞান যেন স্বপ্নে ঐ সমস্যা সমাধানের হদিস দেয়। যেহেতু নির্জ্ঞান সংজ্ঞানের পরিপূরক তাই সংজ্ঞান যে বাস্তব নিয়ে হিমসিম খায়, নির্জ্ঞান যেন তার অপরিসীম জ্ঞানভাণ্ডার থেকে ঐ সমস্যা সমাধানের উপায় বাতলায়।

কিন্তু সমস্যা সমাধান বিচারমূলক ক্রিয়া। যেহেতু সংজ্ঞানই বাস্তবঘেষা তাই সংজ্ঞানই বাস্তববিচারে সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম। নির্জ্ঞানের সাথে বাস্তবের কোন যোগাই নাই। নির্জ্ঞানের কাছে ত কল্পনাই একমাত্র বাস্তব। কাজেই এই বাস্তব জগতের সমস্যা নিয়ে নির্জ্ঞান মাথা ঘামায় কি করে এবং সংজ্ঞানকে স্বপ্নে সমস্যা সমাধানের উপায়ই বা বলে কি করে? সুতরাং বুঝতে হবে, ইয়ুং-এর স্বপ্ন নির্জ্ঞানের সৃষ্টি নয়। ইয়ুং-এর মতে স্বপ্ন আসলে ঘুমের মধ্যে সংজ্ঞান চিন্তারই পুনরাবৃত্তি। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "The dream for me is, in the first instance, the subliminal picture of the psychological condition of the individual in his waking state, It presents a résumé of the subliminal association material which is brought together by the momentary psychological situation."[২০]

কিন্তু স্বপ্ন যদি ঘুমের মধ্যে জাগ্রত জীবনের চিন্তারই পুনরাবৃত্তি হয়, তবে তাকে নির্জ্ঞান মনের সৃষ্টি বলার কি অর্থ হয়? অথচ ইয়ুং একাধিকবার একথা বলেছেন যে স্বপ্ন ব্যক্তি-নির্জ্ঞান বা জাতি-নির্জ্ঞানের সৃষ্টি। কাজেই এ বিষয়ে ইয়ুং-এর চিন্তার মধ্যে কোন সঙ্গতি নাই।

১৭ Jung, Collected Papers on Analytical Psychology, P. 231.

১৮ Jung, Modern Man in Serach of a Soul, p. 25.

১৯ Freud, Collected Papers, vol V, p. 196.

২০ Jung, Collected Papers on Analytical Psychology, P. 222

কিন্তু এই নয়, আরও আছে। ইয়ুং-এর মতে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বপ্ন ফ্রয়েড কথিত যৌন ইচ্ছাকে কেন্দ্র করেও রচিত হতে পারে। অর্থাৎ স্বপ্নের মধ্যে অজাচার কাম দেখা দিতে পারে। বলেছেন: "If, for instance an incest phantasy is clearly shown to be a latent content of the dream, one must subject the patient's *infantile relations* towards his parents and his brothers and sisters, as well as, his relations towards other persons who are fitted to play the part of his father or mother in his mind, to a careful examination on this basis."[২১]

কিন্তু স্বপ্নের উপাদান হিসাবে ইয়ুং শৈশব অজাচার কাম মানেন, কি করে? তাঁর মতে ত শিশুর কোন কামজীবন নাই। কামের আবির্ভাব যৌবনের আগমনে। তবে কি যৌবনে প্রথম অজাচার কামের আবির্ভাব হয়? তাই যদি হয় তাহলে উপরের উদ্ধৃতিতে 'infantile relations' বলা হয়েছে কেন? আর যৌবনেই যদি অজাচার কামের প্রথম আবির্ভাব ঘটে তবে ত সেই অভিজ্ঞতা সকলের সজ্ঞানেই টিকে থাকা উচিত। কিন্তু তা থাকে না কেন?

উদ্বায়ুর সম্পর্কেও তাঁর মত বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। তাঁর মতে, বাস্তবক্ষেত্রে প্রতিযোজনের (adaptation) ব্যর্থতাই উদ্বায়ুর কারণ। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, একজনের পক্ষে বাস্তবে প্রতিযোজন সম্ভব হয়, অপরের বেলা তা হয় না কেন? বুঝতে হবে, প্রতিযোজনের জন্যে যে মনঃশক্তির প্রয়োজন দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার অভাব। কিন্তু মনঃশক্তির অভাব ঘটতে পারে তখনই যখন সে শক্তি অন্যত্র নিয়োজিত হয়। অর্থাৎ উদ্বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অন্তর্জগতের দ্বন্দ্বে শক্তির অপচয় হওয়ার দরুণ ব্যবহারিক জগতের পক্ষে প্রয়োজনীয় শক্তি আর পাওয়া যায় না। কাজেই ব্যক্তির পক্ষে বাস্তবকে আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় না। সুতরাং উদ্বায়ুর কারণ, বাস্তবে পরাজয় নয়; আসলে এ রোগের দরুণই বাস্তবে পরাজয় ঘটে। ইয়ুং এ ক্ষেত্রে কার্যকে (effect) কারণ (cause) রূপে দেখেছেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে ইয়ুং ফ্রয়েড সমর্থিত যৌনইচ্ছার বিশৃঙ্খলাকেও উদ্বায়ুর কারণ বলে মানেন এবং সে ক্ষেত্রে তিনি ফ্রয়েডীয় চিকিৎসারই পক্ষপাতী। কিন্তু তিনি ফ্রয়েডের কামতত্ত্ব (sexual theory) এবং শৈশব কাম (infantile sexuality) প্রভৃতি প্রধান বিষয়গুলি না মেনে তাঁর উদ্বায়ু তত্ত্বকে কেবল মানেন কি করে? ইয়ুং স্পষ্টই বলেছেন, শৈশবে নয়, যৌবনেই যৌনতার আবির্ভাব: "Psychic birth, and with it the conscious distinction of the ego from the parents, takes place in the normal course of things at the age of puberty with the eruption of sexual life."[২২] এ মত ফ্রয়েডের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। ফ্রয়েডের মতে শিশুর জীবন সমস্যাবহুল এবং যৌন সমস্যা তার অন্যতম। এই যৌন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উপরেই শিশুর ভবিষ্যৎ চরিত্র নির্ভর করে। অথচ ফ্রয়েডের এই গুরুত্বপূর্ণ মতটি না মেনে ইয়ুং অবস্থা বিশেষে তাঁর উদ্বায়ু তত্ত্বকে সমর্থন করেন। একি ইয়ুং-এর পক্ষে, ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটকাভিনয় দেখার মত তাজ্জব ব্যাপার নয়? আসলে স্বপ্নতত্ত্বের মতই, এক্ষেত্রেও তাঁর চিন্তার মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতি আছে।

ইয়ুং-এর মতে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা মানুষের এক মৌলনোদনা (drive)। কাম বা অন্য

২১ Jung, Collected Papers, p. 221.

২২ Jung, Modern Man in Search of a Soul, P. 113

জৈবিক প্রবৃত্তির উৎপন্নফল, ধর্ম মোটেই নয়। তিনি তাই বলেছেন, ".. ...the spiritual appears in the Psyche likewise as a drive, indeed as a true passion. It is no derivative of another drive but a principle sui generis, namely, the indispensable formative power in the world of drives."[২৩] ইয়ুং-এর ব্যাখ্যাকার শ্রীমতী ফর্ডহামের মতে, ধর্মের প্রচণ্ড শক্তি ধর্মকে মানবজীবনে অপরিহার্য করে তোলে। তিনি বলেছেন, ".....it is the dynamism of the religious function that makes it both futile and dangerous to try to explain it away. This dynamism was expressed in the past in the great proselytizing movements, in crusades, religious ways, and persecutions, in heresy hunts and witch hunts, and in the creative efforts which caused men to build vast tombs and places of worship filled with every kind of treasure. To-day much of this energy finds its expression in the various 'isms'—Communism, Nazism, Fascism, etc."[২৪]

মৌলশক্তি হিসাবে ধর্মের বিভিন্নরূপে প্রকাশ ঘটতে পারে। সৃষ্টিমূলক কার্য, যেমন বিভিন্ন ভজনালয়, দেবদেউল প্রভৃতি নির্মাণের মধ্যে, ধর্মযুদ্ধের মধ্যে অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে এর প্রকাশ ঘটতে পারে। প্রশ্ন এই যে, ধর্মের পক্ষে যদি এই প্রকার রূপান্তর গ্রহণ সম্ভব হয় তাহলে ধর্ম যে নিজেও কোন অধিকতর মৌলশক্তির প্রকাশ নয় তার প্রমাণ কি? আর ধর্মকে কোন কারণে যদি এক স্বতন্ত্র বৃত্তি বলেই মানতে হয়, তবে ঐ একই কারণে, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, দর্শন ও নৈতিকতা প্রভৃতি ব্যাখ্যার জন্যও শিল্পবৃত্তি, রাজনীতিবৃত্তি, দর্শনবৃত্তি নীতিবৃত্তি প্রভৃতি স্বতন্ত্র মৌল বৃত্তি স্বীকার করা উচিত। মানুষের জীবনে ধর্মের যেমন প্রভাব এদেরও তেমনি প্রভাব। এদের অমৌল বলে কেবল ধর্মকেই মৌলিকত্ব দেওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? ধর্মের প্রতি এই অহেতুক পক্ষপাতিত্ব এ বিষয়ে তাঁর অযৌক্তিকতারই পরিচয় দেয়।

এরপরও যদি কেউ বিশ্বাস করে যে ইয়ুং-এর চিন্তা ফ্রয়েডের চেয়ে উন্নততর ও গভীরতর তবে বুঝতে হবে ইয়ুং-এর প্রতি তার অচলা ভক্তি। অপ্রিয় হলেও আমরা একথা বলতে বাধ্য যে, ফ্রয়েডের তুলনায় ইয়ুং-এর মনস্তাত্ত্বিক চিন্তার অনেক অধঃপতন ঘটেছে। আসলে তিনি প্রাক-ফ্রয়েডীয় প্রচলিত সজ্ঞান মনস্তত্ত্বের যুগে আবার ফিরে গেছেন এবং সজ্ঞানকেই মনের একমাত্র পরিচয় বলে কার্যতঃ মেনে নিয়েছেন। মুখে নির্জ্ঞানের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রচার করলেও কার্যক্ষেত্রে যে তিনি সজ্ঞানকেই মনের সর্বস্ব ভেবেছেন তা প্রমাণিত হয় তার স্বপ্ন ও উদ্বায়ু সম্পর্কে ধারণা থেকে। স্বপ্নকে তিনি সমস্যামূলক চিন্তন এবং উদ্বায়ুকে বর্তমান বাস্তবে পরাজয়ের ফল বলেছেন। কিন্তু সজ্ঞানই বাস্তবধর্মী। নির্জ্ঞান ত সম্পূর্ণ বাস্তব-নিরপেক্ষ। সেখানে কল্পনাই বাস্তব। কাজেই সেখানে ভিন্ন নিয়মের প্রচলন থাকা উচিত। কিন্তু ইয়ুং বলেছেন, নির্জ্ঞান যে সজ্ঞান থেকে আলাদা নিয়মে পরিচালিত হয় তার কোন প্রমাণ নাই: "Now we have no reasons for assuming that the unconscious follows other laws than those which apply to conscious thought. The unconscious, like the conscious,

২৩ Jung, Contributions to Analytical Psychology, P. 66

২৪ Frieda Fordham, An Introduction to Jung's Psychology, P. 71

gathers itself about the biological problems and endeavours to find solutions for these by analogy with what has gone before, just as much as the conscious does."[২৫]

এর অর্থ কি এই নয় যে, নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞান সমপ্রকৃতি ? স্বপ্ন এবং উদ্বায়ু প্রসঙ্গে তিনি নির্জ্ঞানের যে পরিচয় দিয়েছেন তাতেও বোঝা যায়, নির্জ্ঞান সংজ্ঞানের অস্পষ্ট সংস্করণ মাত্র। স্বপ্নের সমালোচনা সম্পর্কে উপরে উদ্ধৃত তাঁর "subliminal" কথাটির ব্যবহার এ প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয়। নির্জ্ঞানের যদি এই পরিচয় হয়, তবে ইয়ুং-এর নির্জ্ঞান ফ্রয়েডের আসংজ্ঞান (preconscious) বা প্রচলিত মনোবিদ্যার অন্তর্জ্ঞান (subconscious) ছাড়া আর কি ? অর্থাৎ তাঁর নির্জ্ঞানে আদিমতা (archaic heritage) বা গতীয়তার (dynamism) কোন চিহ্নই কার্যতঃ নাই। কাজেই ইয়ুং কার্যতঃ নির্জ্ঞান বলে কিছু মানেন নি। কেবল স্তরীয় মনোবিদ্ বলে পরিচিত হওয়ার মোহে নির্জ্ঞান, জাতি-নির্জ্ঞান ইত্যাদি কথাগুলি আড়ম্বরের সহিত ব্যবহার করেছেন। আসলে তিনি প্রচ্ছন্ন (disguised) সংজ্ঞান মনোবিদ্।

---

২৫ Jung, Collected Papers, P. 223

আমি ও আমার মন

(পাঁচ)

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল এম. এ.

বিপর্যয়

'সংশয়' জ্ঞানের পর এবার 'বিপর্যয়' জ্ঞানের আলোচনা করা যাক্। 'বিপর্যয়' অর্থাৎ 'ভ্রম' জ্ঞান বা 'ভ্রান্তি'। প্রশস্তপাদর মতে 'বিপর্যয়' দ্বিতীয় প্রকারের "অবিদ্যা"। ইন্দ্রিয়ের দ্বারে আমরা বস্তুর যথাযথ তত্ত্বটি জানতে পারি—এটাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সব সময় কি সত্য ঘটনাটি জানতে পারি ? না, বেশীর ভাগ সময়ই সত্যটি গা ঢাকা দেয়। বেশীর ক্ষেত্রেই আমরা ভ্রমে পড়ি। ভুল করায় তাই মানুষের যেন জন্মগত অধিকার দাঁড়িয়েছে। ইংরেজীতে তাই প্রবাদ—To err is human. মুণি ঋষিদেরও ভ্রম হতে পারে—'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ'।

ভ্রম জ্ঞানের স্বরূপ কি ? আমরা ভুল কেন করি ? এই সব প্রশ্ন নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিকগণের মধ্যে তর্ক বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলি বিবেচনা করে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে গেছেন। সংক্ষেপে কয়েকটি মতামত আলোচনার চেষ্টা করবো।

এক কথায় 'অতস্মিন্ তদ্' এই জ্ঞানকে ভ্রমজ্ঞান বলা যায়। কোন বস্তুকে অন্যভাবে জানার নামই সাধারণ দৃষ্টিতে 'ভুল করা'। ন্যায় বৈশেষিকদর্শনেও ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে যে জ্ঞানে বস্তুটি যে রূপে বা যে 'প্রকারে' প্রতিভাত হয় সেই 'রূপ' বা 'প্রকার'টি যদি ঐ বস্তুতে না থাকে অর্থাৎ বস্তুটি যদি ঐ রূপ বা ঐ প্রকারের না হয় তবে তাহাকে ভ্রম জ্ঞান বলে। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। রজ্জুটি যদিও আমাদের চোখের সম্মুখে উপস্থিত, জানবার সময় তাকে জানলাম সর্পরূপে— রজ্জুরূপে নয়। এই অন্যরূপে বা অন্যপ্রকারে জানার জন্য জ্ঞানটি ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হ'ল।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, কেন রজ্জুটিকে রজ্জুরূপে না জেনে সর্পরূপে জানলাম ? কোন বস্তুকে ঠিকভাবে জানার যে কারণ সমষ্টি থাকে এখানে তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন দোষ ঘটেছে, কারণ সামগ্রীর কোন অংশ নিশ্চয় বিকল হয়েছে। যেমন চক্ষু প্রভৃতি যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানছি তার মধ্যে কোন গোলমাল থাকতে পারে। পিত্তদোষ (Jaundice) প্রভৃতি রোগে তুষার-শুভ্র শঙ্খকেও হলুদ রঙের বলে মনে করে থাকি। অথবা যে পরিবেশের মধ্যে দেখছি সেখানে আলো এত কম যে দড়িটাকেও সাপ বলে মনে করে ভয়ে আঁতকে উঠি। অথবা এ'ও হতে পারে যে বাইরের ঘটনার মধ্যে কোন বৈকল্য নেই, আসলে মনের ভেতরেই গোলযোগ। হয়ত আগে থাকতেই "অ-দৃষ্টে"র পরিহাসে কোন ধারণা মনকে অধিকার করে বসেছে—যেমন অন্ধকার রাস্তার বেলগাছে 'বেহ্মদত্যি' থাকে। তাই বাতাসে গাছের পাতা নড়া থেকেই চেঁচিয়ে উঠ্লুম—'বেহ্মদত্যি'। এইরূপ বিভিন্ন 'সামগ্রী বৈকল্যে'র ফলে ভুল দেখা হতে পারে।

ভুল দেখার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণটি হচ্ছে "সাদৃশ্যজ্ঞান"। সাধারণ বা স্বাভাবিক (normal) ক্ষেত্রে দৃষ্ট বস্তুর যে যে ধর্মের অভিজ্ঞতা লাভ করছি সেই সেই ধর্ম অন্য বস্তুতে পুর্বে থাকতে দেখেছি বলেই

এখন সেই অন্য বস্তুর কথা মনে এসেছে। উভয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকার ফলেই এই রকম হ'তে পারে। এদিক দিয়ে 'সংশয়' জ্ঞানের সঙ্গে 'বিপর্যয়' জ্ঞানের কতকটা মিল আছে। 'সংশয়' জ্ঞানেও সাদৃশ্যজ্ঞান অন্যতম কারণ। কিন্তু তফাৎ এই যে, সংশয়ের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যজ্ঞানের ফলে উভয় বস্তুই মনে উপস্থিত হয় এবং এই 'উভয় কোটির' মাঝে মনটি ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলতে থাকে, কিন্তু 'বিপর্যয়ে'র ক্ষেত্রে সাদৃশ্যজ্ঞান থেকে একটি 'কোটি'ই উপস্থিত হয় এবং তা থেকে হয় অসন্দিগ্ধ নিশ্চয় জ্ঞান। নিশ্চয় জ্ঞানকে তাই দূরকমেরই বলা যেতে পারে—ভ্রম নিশ্চয় এবং প্রমা নিশ্চয় বা সত্য নিশ্চয়।

উক্তরূপ 'সাদৃশ্যজ্ঞান' থেকে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণের ফলে পূর্বদৃষ্ট সর্পের সংস্কার আমাদের স্মৃতি পথে উদয় হয়েছে। কিন্তু আসল সমস্যা এইখানে যে, 'ইহা সর্প' এই যে 'প্রত্যক্ষ জ্ঞান' উৎপন্ন হ'ল তার মধ্যে 'সর্পটি' কোথা থেকে এসে উদয় হ'ল? সম্মুখে উপস্থিত যে সকল বস্তু তার মধ্যে ত সর্পের 'নাম গন্ধ' নেই। আর তা যদি না থাকে তবে তার 'প্রত্যক্ষ' হবে বা কি করে? অনুপস্থিত বস্তুর ত 'প্রত্যক্ষ জ্ঞানে' ভাসমান হওয়াটা স্বাভাবিক নয়। আরও বিবেচ্য যে এটা "বাহ্য প্রত্যক্ষ" অর্থাৎ চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় থেকে উৎপন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞান। চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় সাধারণতঃ বাহিরে উপস্থিত বস্তুকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাঝে এনে হাজির করে দিতে পারে। যেমন আদালতের পেয়াদা যে ব্যক্তি বাড়িতে উপস্থিত তাকেই ধরে এনে আদালতে হাজির করতে পারে, যে ব্যক্তি উপস্থিত নেই অর্থাৎ পালিয়ে গেছে তাকে ত আর হাজির করাতে পারে না। কাজেই অনুপস্থিত যে বস্তু অর্থাৎ সর্প তা এই বাহ্যপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে হাজির হ'ল কেমন করে?

নৈয়ায়িকগণ সহজ পন্থায় এর একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন—'সাদৃশ্যজ্ঞান' থেকে উৎপন্ন যে সর্পের স্মরণ তাই এখানে সর্পের প্রত্যক্ষে সহায়তা করে। অর্থাৎ সর্পের ভ্রমপ্রত্যক্ষের পেছনে ঐ সর্পের স্মৃতিটিরই কারসাজী আছে। বাহিরে সর্পটি উপস্থিত না থাকলেও স্মৃতির বিষয় হিসাবে সর্পটি উপস্থিত কাজেই পরক্ষণে উৎপন্ন প্রত্যক্ষ ভ্রমের মধ্যে সর্পরূপ বিষয়টিকে পূর্বক্ষণে উপস্থিত এই সর্প স্মৃতি এনে হাজির করে। বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বোঝা দরকার। যে স্থানে এবং যে কালে আমরা রজ্জুকে সর্প বলে ভুল করছি সে স্থানে এবং সেই সময় সর্পটি সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও সর্পরূপ বস্তুটি নিছক অলীক বস্তু নয়, বা সর্প নামক দ্রব্য পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে লোপ পায় নি। অন্য দেশে অন্য স্থানে সর্প সশরীরে বিদ্যমান এবং অন্য কালে তা আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার সংস্কার আমাদের মনে সঞ্চিত থাকে এবং সময় বিশেষে নানা কারণে তাথেকে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মরণ হয়। অনুভব→সংস্কার→স্মরণ এই পরম্পরার মধ্যে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যে, পূর্বে যে বস্তু যে দেশে ও যে কালে আমরা অনুভব করি অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভাবে জানি পরে সেই বস্তু ঠিক সেই ভাবেই আমাদের স্মৃতিপথে উদয় হয়। পূর্বে যদি রামবাবুকেই দেখে থাকি শ্যামবাবু না দেখে থাকি—তবে স্মরণের সময় রামবাবুর স্মরণ হবে, শ্যামবাবুর নয়। আর বিশ বৎসর বাদেও যদি রামবাবুর কথা মনে পড়ে তবে বিশ বছর আগের রামবাবুকেই মনে করবো। ইতিমধ্যে রামবাবুর সহস্র পরিবর্তন হয়ে গেলেও তা যদি না জানা থাকে তবে সে পরিবর্ত্তিত রামবাবুকে কোন ক্রমেই মনে করতে পারবো না। আবার অনেক সময় স্মরণের মধ্যে পূর্ব অনুভবের সমগ্র আকার ফোটে না, কোন কোন অংশ হারিয়ে যায় বা লুকিয়ে থাকে। যেমন, রামবাবুকে হয়ত মনে পড়ল, কিন্তু কোন সময় কোথায় তাকে দেখেছিলাম তা হয়ত মনে পড়ছে না, অথবা হয়ত রামবাবুর চেহারাটা মনে পড়ছে, তার নামটা মনে পড়ছে না,—হয়ত মুখটা মনে পড়ছে গায়ের

রঙ্‌টা মনে পড়ছে না। কিন্তু মোটের উপর মনে যেটা পড়ছে সেটা কখনই অলীক বস্তু হতে পারে না। বিশেষ দেশে বিশেষ কালে তা অবশ্য বাস্তব। এখানে রজ্জুকে দেখে সাদৃশ্যবশতঃ যে সর্পের স্মরণ তা "শুধু সর্পরূপেই" স্মরণ হ'ল। "শুধু সর্পরূপে" কথাটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ যখন ঠিক ঠিক স্মরণ হয় তখন "সেই রামবাবু" "সেই সর্প" এই রকম আকারেই স্মরণ হয়ে থাকে। এখানে 'সেই' বলতে পূর্বে অনুভূত সেই দেশ কাল সেই পরিবেশের বস্তুটিকে বোঝায়। কিন্তু অনেক সময় "শুধু" স্মরণ হতে পারে; "সেই" অংশ হারিয়ে যেতে পারে বা লুকিয়ে থাকতে পারে অর্থাৎ সেই দেশকালের বন্ধনটি লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এরূপ স্মরণকেই "শুধু" স্মরণ বলছি। দার্শনিকগণ এর একটা গালভরা নাম দেন—"প্রমুষ্টতত্তাক স্মরণ"।

এই "প্রমুষ্টতত্তাক" সর্পের স্মরণাত্মক জ্ঞানই পরবর্ত্তী সর্পের ভ্রমপ্রত্যক্ষের কারণ হয়; ঐ স্মরণটিই বহিরিন্দ্রিয় চক্ষুর সঙ্গে ভিন্ন দেশে ভিন্ন কালে অবস্থিত সর্পের একটা সম্পর্ক স্থাপিত করে। নৈয়ায়িকগণ একে "জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষ" নাম দিয়েছেন। প্রত্যক্ষ হতে গেলেই বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না হ'লে হবে না। এখন সর্পের ভ্রমপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সর্পরূপ বিষয়টি সশরীরে অনুপস্থিত থাকায় চক্ষুর সঙ্গে সাধারণ পথে সম্পর্ক যুক্ত হতে পারে না, কারণ রজ্জুর সঙ্গেই চক্ষু সাধারণ ভাবে সংযুক্ত। তাই নৈয়ায়িক বলছেন—ঐ সর্পের স্মরণটিই এখানে "সন্নিকর্ষ" অর্থাৎ অন্যত্র অন্য কালস্থ সর্পকে চক্ষুর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করার ঘটক। কাজেই ভ্রমপ্রত্যক্ষে "সন্নিকর্ষ" রূপে সে কারণ।

স্মরণ থেকে প্রত্যক্ষ হচ্ছে—অর্থাৎ স্মরণের বিষয় যে প্রত্যক্ষে ভাসমান হয়—একথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত বাজে কথাও নয়। অনেক ক্ষেত্রে তা নিঃসন্দেহেই ঘটে থাকে। যেমন দৃষ্টান্ত "প্রত্যভিজ্ঞা" পূর্বে দেখা কোন বস্তু পরে আবার দেখে পূর্বের সেই বস্তুটি বলে চিনতে পারা—যা আমরা হামেশাই করে থাকি, তাকেই দার্শনিকেরা "প্রত্যভিজ্ঞা" বলেছেন। যেমন অনেকদিন পরে রামবাবুকে দেখে বললুম—"এই সেই রামবাবু"। এখানে "এই" বলতে বর্ত্তমান রামবাবুকে লক্ষ্য করছি আর "সেই" বলতে সেই পূর্বের দেখা রামবাবুকে লক্ষ্য করছি। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উভয় কালের রামবাবুই বিষয়রূপে ভাসমান। বর্ত্তমান কালের রামবাবু না হয় চোখের সামনে হাজির, কাজেই প্রত্যক্ষের বিষয় হতে তার কোনো বাধা নেই। কিন্তু সেই অতীতকালের রামবাবুকে প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে হাজির করাল কে? নিশ্চয়ই সেই রামবাবু-বিষয়ক স্মরণাত্মক জ্ঞান। নৈয়ায়িকের ভ্রমপ্রত্যক্ষেও সর্পটিকে হাজির ঐ সর্পের "প্রমুষ্টতত্তাক" স্মরণ।

এই হ'ল নৈয়ায়িক মতে মোটামুটিভাবে বিপর্যয় বা ভ্রমজ্ঞানের ব্যাখ্যা। মীমাংসকের দৃষ্টিভঙ্গী অন্য ধরণের, তাঁদের ব্যাখ্যাও স্বতন্ত্র। আগামীবারে ভ্রমজ্ঞান সম্পর্কে অন্যান্য মতামত আলোচনা করা যাবে।

স্নেহের অন্তরালে

তড়িৎকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ.

আমরা সবাই জানি যে, ছোটবেলায় আমরা মা-বাবার, বিশেষ ক'রে মায়ের, আদর যত্নের উপর নির্ভর করি। অর্থাৎ মায়ের কাছ থেকে আহার্য ছাড়াও তার ভালবাসা আমরা পেতে চাই। খুব ছোটবেলায় মায়ের কাছে পাবার ইচ্ছেটাই প্রবল থাকে, কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেবার ইচ্ছেটাও হয়; অর্থাৎ মা-বাবা আমার ভালবাসা গ্রহণ করুক এরকম ইচ্ছেটাও থাকে। এই দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যে দিয়েই মা-বাবার সঙ্গে আমাদের মধুর সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে। যাকে আমি দিতে চাই সে যদি গ্রহণ ক'রে আমার দেওয়ার ইচ্ছেকে পূরণ করে এবং যার কাছে আমি নিতে চাই সে যদি বাঞ্ছিত বস্তু দিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট করে তা হলে আমার জীবন স্বমিতভাবে গ'ড়ে উঠবে আশা করা যায়। এ কথা ঠিক যে ছোটবেলায় আমাদের মনে যেসব ধারণা জন্মায় সেগুলো আমাদের জন্মগত স্বভাবের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাদের মনের পরিপুষ্টি সাধন করে। ছোটবেলায় মনেতে প্রভাব, যে-ভাবে পড়বে বা আমরা যে-ভাবে গ্রহণ করব সেই ভাবেই আমাদের ব্যক্তিত্বের ভিত্তি তৈরি হবে। বড় হওয়ার পর আমরা কী ভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করব বা কী ভাবে নিজেদের প্রকাশ করব—এক কথায়, আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নির্ভর করবে ছোটবেলায় আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠন হয়েছে যে-ভাবে অনেকাংশে তার উপর। ছোটবেলায় ব্যক্তিত্বের ভিত্তি স্থাপন স্বমিতভাবে না হলে পরে স্বভাবি ব্যক্তিত্ব-গঠনের সম্ভাবনা ক'মে যায়।

ব্যক্তিত্ব-গঠন ও তার বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা আমি এখানে করব না। ছেলে-মেয়ের প্রতি মা-বাবার, বিশেষ ক'রে মায়ের, ব্যবহার যে তাদের সুস্থ সামাজিক মানুষ হিসেবে গ'ড়ে ওঠার পথে নানান প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। মায়ের কোনও কোনও ব্যবহার অনেক সময় ছেলেকে মানসিক ব্যাধির কবলে পড়তেও সাহায্য করে। চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (schizophrenia) এক ধরণের মানসিক রোগ যাতে রোগী বাইরের জগতের সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে নিজের এক জগৎ সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যেই বিচরণ করতে থাকে। এ রোগের নিদান সম্বন্ধে এখনও কোনও সঠিক সিদ্ধান্ত করা যায় নি, কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে ছেলের প্রতি মায়ের বিশেষ ব্যবহার এজন্য অনেকখানি দায়ী।

ছেলে-মেয়েদের মানসিকস্বাস্থ্য গঠনে পিতামাতার প্রভাবের কথা ফ্রয়েড্ অনেক আগেই বলে গেছেন, এবং ইদানীংকালে সুলিভন্ ও অন্যান্য মনোবিদরা ফ্রয়েড্‌কে সমর্থন করেছেন। আজ পিতামাতার এই প্রভাবের কথা প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত। মানুষ বা যন্ত্র, সর্ব ক্ষেত্রেই, আমরা দেখতে পাই ঠিক সময়ে ঠিক জিনিস না পেলে তার সুষ্ঠু-ভাবে চলার অসুবিধে হয়। ঠিক যে-সময় আমার কিছু টাকা পেলে উপকার হয়, সে-সময় যদি আমি টাকা না পাই, তখন অসুবিধে হবেই; পরেও আমাকে এই অসুবিধের জের টেনে যেতে হবে। পিতামাতার ভালবাসার ক্ষেত্রেও ঠিক এই কথা বলা যায়। ঠিক যে-সময় পিতামাতার ভালবাসা পেলে ছেলে-মেয়েদের মন পুরিপুষ্ট হয়, সে-সময় ভালবাসা না পেলে ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের মনে ব্যর্থতা-বোধ থেকে যাবে। ফ্রুগল্ বলেছেন ঠিক সময়ে পিতামাতার ভালবাসার অভাব ছেলে-মেয়েদের

মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে, মানসিক জীবনে চিরন্তন ক্ষত সৃষ্টি করে। ছোটবেলায় না পাওয়ার ব্যর্থতা ভবিষ্যত জীবনে ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্খাকে সব সময়েই জাগিয়ে রাখে কিংবা ভালবাসা না পাওয়ার জন্যে পিতামাতার প্রতি রাগ ও বিদ্বেষপূর্ণ, এক কথায় শত্রুভাবাপন্ন মন গ'ড়ে ওঠে। ছোটবেলায় পিতা-মাতা ও ঐস্থানীয় গুরুজন ব্যক্তিদের প্রতি আমরা যে রকম ব্যবহার করতে শিখি বা তাঁরা আমাদের প্রতি যেরকম ব্যবহার করেন, সেই প্রতিকৃতিই বড় বয়সে আমাদের আচার-ব্যবহার ও প্রতিষ্ঠাসের মধ্যে পাওয়া যায়।

দুষ্ক্রিয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, অপরাধী তার দুষ্কৃতির মধ্যে দিয়ে অতৃপ্ত বাসনাকে পূর্ণ করতে চায়। যাদের সে বাবা-মা বা গুরুজনস্থানীয় মনে করে তাদের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে না-পাওয়ার রাগ ও বিদ্বেষকে প্রকাশ করে অথবা প্রক্ষোভজ জীবনে না-পাওয়ার ক্ষতে অন্যায়ভাবে কিছু নিয়ে প্রলেপ লাগাবার চেষ্টা করে। দুষ্কৃতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি দেখেছি দুষ্কৃতি-প্রবণতা-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব-গঠনে মা-বাবার প্রভাব অনেকখানি। দুষ্ক্রিয়াসক্ত লোকেরা মনে করে যে বাবার কাজই হ'ল অহেতুক শাস্তি দেওয়া, এবং অনুসন্ধানে দেখা গেছে এদের এ ধারণা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই গ'ড়ে উঠেছে; ভালবাসা পাওয়া ও দেওয়ার ব্যাপারে বাবা-মা'র কাছ থেকে শিশুকালে কোনও সাড়া না পাওয়ায় স্বভাবতঃই তাদের মনে এ ধারণা জন্মায় এবং পরবর্তী জীবনে দুষ্কার্যর মধ্যে দিয়ে রাগ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করে অথবা অন্যায়ভাবে কিছু নিয়ে বা কোনও ইচ্ছা পূরণ ক'রে না-পাওয়ার ক্ষোভ দূর করবার চেষ্টা করে।

অনেকক্ষেত্রে পারিবারিক দ্বন্দ্ব শিশুমনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে বাবা কিংবা মা কোনও একজনের প্রতি তার মন বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে যায়। ছোটবেলায় প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন একটা সময় আসে যখন সে বাবা ও মা'র একজনকে বন্ধু, একজনকে শত্রু মনে করে। একজনকে পরিপূর্ণ-ভাবে পাবার পথে আর একজন বাধা দিচ্ছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মন প্রতিবন্ধককারীর দিকে প্রতিকূল হয়। এ ধারণা স্বাভাবিক প্রচয়ের সময় সজ্ঞান মন থেকে ক্রমশঃ লোপ পায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যদি বাবা সত্যিই বন্ধুভাবাপন্ন না হয় অথবা মা অত্যধিক স্নেহপ্রবণ হয় কিংবা পারিবারিক সামঞ্জস্যতা না থাকে তা হলে বাবার প্রতি বিদ্বেষভাব মনের মধ্যে স্থায়ী বন্দোবস্ত করে নেয়। অবশ্য আমি এ কথা বলছি না যে কেবল এই কারণেই মানুষ দুষ্ক্রিয়াসক্ত হয় বা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়; তবে অনেক সময় পিতামাতার ব্যবহার মানুষকে যে এ পথে কিছুটা এগিয়ে দেয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

মা-বাবার ব্যবহারে ছেলেমেয়েরা তাদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ না ক'রে, অনেক সময় তার প্রত্যাখ্যাত ভালবাসাকে নিজের মধ্যে নিয়ে স্বকামজ (narcissistic) হয়ে পড়ে। যে-আধানশক্তি ও আগ্রহ সুস্থ অবস্থায় অন্যলোককে আনন্দদান করতে পারত তা (মা-বাবার বিরূপ মনো-ভাবে ভালবাসার কোনও প্রত্যুত্তর না পেয়ে) শুধু নিজের স্বার্থে প্রযুক্ত হ'য়ে মানুষ নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয় এবং অসুস্থ মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়।

চিত্তভ্রংশী বাতুলতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় যে, মায়ের, বিশেষ ধরণের ব্যবহার এ-রোগের জন্যে অনেকাংশে দায়ী। এটাই একমাত্র কারণ নয়। তবে, এ-রোগের উৎপত্তিতে মায়ের ব্যবহার বিশেষ সাহায্য করে। এ বাতুলতার প্রধান লক্ষণ বাস্তব জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং বাইরের জগৎ সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ প্রকাশ না করা। এদের কাথাবার্তা ও চিন্তাধারার মধ্যে কোনও

সামঞ্জস্য থাকে না। এক কথায় সমস্ত ব্যক্তিত্বের অধোগমন ঘটে। বিশেষজ্ঞরা এ ধরণের রোগীর মায়েদের নিয়ে গবেষণা ক'রে প্রধানতঃ দু'রকমের মায়ের সন্ধান পেয়েছেন। যারা অত্যাধিক আদরযত্ন দেয় এ রকমের মা'রা চায় যে ছেলেমেয়েরা সব সময়েই তাদের কথা মেনে চলবে। ছেলে-মেয়েদের স্বাধীনভাবে কিছু করতে দিতে তাদের আপত্তি। আর এক ধরণের মা, তাদের ব্যবহারে ছেলেমেয়েদের প্রতি বিতৃষ্ণা সোজাসুজিভাবে প্রকাশ করে। ছেলেমেয়েকে ভালবাসে না এ কথা প্রকাশ করতে তাদের কোনও আপত্তি তো নেই-ই, এমন কি ব্যবহারে তা ফুটিয়ে তুলে তারা আনন্দলাভ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই ধরণের মায়েরা তাদের নিজেদের জীবনে যে-ব্যর্থতা পেয়েছে ছেলেমেয়ের প্রতি ব্যবহারে তারই পরিচয় দিয়ে থাকে। তাদের নিজের জীবনে ব্যর্থতার দরুণ যে-রাগ ও বিদ্বেষ জমা হয় তা তাদের ব্যবহারে প্রকাশ পায়। যে-সব মায়েরা ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত আদরযত্ন দেয় তাঁদের মধ্যেও রাগ ও বিদ্বেষ রয়েছে; অতিরিক্ত আদরযত্ন দেখিয়ে তা ঢাকা দিয়ে রাখে। ভালবেসে এবং কর্তৃত্ব দেখিয়ে এরা নিজের স্বার্থপর আকাঙ্খাকেই পরিতৃপ্ত করে। ভালবাসা দেখালেও, এদের নির্জ্ঞান-মনে বিতৃষ্ণার ভাব থাকে এবং ছেলেমেয়েরাও ভালবাসা ও অতিরিক্ত কর্তৃত্বের মধ্যে নিহিত বিতৃষ্ণাটা ধরতে পারে।

একটি চিত্তভ্রংশীবাতুল রোগীর মা ছেলের খুব প্রশংসা করতেন এবং ছেলের প্রতি ভালবাসা প্রকাশও করতেন। কিন্তু তাঁর ধারণা তাঁর স্বামী এবং ছেলের বন্ধুরাই ছেলের রোগের জন্যে দায়ী। পরে কথাবার্তা ও পরীক্ষার মাধ্যমে ছেলের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার ভাব ও কর্তৃত্ব-করবার ইচ্ছা ধরা পড়ে। ছেলেকে ভালবাসেন এ কথা বার বার প্রমাণ করতে চাইলেও ছেলেকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা বললে তিনি কতগুলো অজুহাত দেখিয়ে তাঁর অনিচ্ছা প্রকাশ করতেন।

ছেলেমেয়েরা মায়ের বিতৃষ্ণার ভাব বুঝতে পারে এবং তাদের মনেও মায়ের প্রতি রাগ ও বিদ্বেষ জমা হয়ে থাকে। আবার মায়ের অতিরিক্ত আদরযত্নের জন্যে তারা ক্রমশঃই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং বড় হয়ে তারা অন্যের উপর নির্ভর করতে চায় যার জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করায় তারা অনেক অসুবিধা বোধ করে। অনেক চিত্তভ্রংশী বাতুল মায়ের প্রতি রাগ ও বিদ্বেষ প্রকাশ ক'রে থাকে। এদের ধারণা মা তাদের প্রাপ্য-বস্তু থেকে বঞ্চিত করেছে।

একটি রোগী বলেছিল সে কাজ করার প্রেরণা পায় না কারণ, মা তার সব কিছু নিয়ে নিয়েছে এবং যা প্রাপ্য তা থেকেও বঞ্চিত করেছে। সে কিছু করতে পারবে না। তার বউ তার হয়ে সব কাজ ক'রে দেবে (রোগী অবিবাহিত) এবং সে তারই উপর নির্ভর ক'রে থাকবে। সে আরও বলেছিল যে মা তার বউ।

একটি চিত্তভ্রংশী বাতুল রোগিণীর মা বলেছিলেন তিনি মেয়েকে (রোগিণীকে) ভালবাসেন না, ছেলেকেই ভালবাসেন; এই ভাব মেয়ের প্রতি ব্যবহারে সব সময়েই প্রকাশ পেত। হাসপাতালে, রোগিণী কর্তৃক অঙ্কিত ছবি থেকে এবং তার সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে তার মনোভাব জানবার চেষ্টা করা হয়। মেয়েটির ধারণা মা তার প্রাপ্য সব কিছু থেকে বঞ্চিত ক'রে ভাইকেই সব কিছু দিয়েছে এবং সেজন্য তার কিছু করবার ক্ষমতা নেই। একটি বয়স্থা মহিলা তাঁর নিজের কাজ করার অক্ষমতার জন্যে তাঁর বোনকে ও মাকে দায়ী করতেন। তাঁর ধারণা মা তাঁকে ছোটবেলায় দুধ দেয় নি, বোনকেই সব দিয়েছে। এখন তিনি কাজ করার মতো জোর পান না, কারণ তিনি ছোটবেলায় মায়ের দুধ পান নি। তাঁর মতে এখন

এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় হল বোনের মল গ্রহণ করা। তাঁর ধারণা বোনের মলেতে মায়ের দুধ আছে এবং সেটা খেতে পারলে তিনি আবার জোর পাবেন। কিন্তু তাঁর ধারণা বোন কুয়োতে প'ড়ে মারা গেছে, তাই এখন তার মল পাওয়া সম্ভব নয়; সেজন্য কোনও কাজই এখন তিনি করতে পারবেন না।

ছোটবেলায় মায়ের দুধ-না পাওয়ার মনঃসৃষ্টি প্রক্ষোভজ জীবনে প্রচুর ব্যর্থতা আনে এবং মা-বাবার প্রতি বিশেষ ক'রে মায়ের প্রতি, রাগ ও বিদ্বেষ মনের মধ্যে জমা হয়ে ওঠে। তখন মা-বাবার দেওয়া সব জিনিসই "রাগ-মেশানো" মনে হয় এবং সহজ মনে তা গ্রহণ করতে পারে না। চিত্তভ্রংশী-বাতুলতাগ্রস্ত হ'তে ছেলেমেয়েদের মনঃসৃষ্টি কতটা দায়ী, আর ছেলেমেয়েদের প্রতি মা-বাবার ভালবাসার অভাব কতটা দায়ী তা সঠিক বলা যায় না। আমার মনে হয় মা-বাবার অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার ছেলে-মেয়েদের মনঃসৃষ্টিকে স্থায়ী ক'রে মানসিক জীবনে তার প্রভাব বাড়িয়ে দেয়। ছোটবেলায় প্রক্ষোভজ জীবনের এই আঘাত পরে সুস্থ জীবন-যাপনে অসুবিধার সৃষ্টি করে।

আগেই বলেছি যে চিত্তভ্রংশীবাতুল রোগীদের বেলায় মা ও ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক শৈশবে ছেলে-মেয়েদের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে-বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা এখনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারেন নি। তাঁরা এখনও গবেষণা ক'রে চলেছেন। তবে এ প্রকল্পের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

চিন্তার প্রকৃতি

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়*

(২)

"চিন্ত"-র ১৩৬৭ মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় প্রাক্ গেস্টাল্ট্ সময় (pre-gestalt period) পর্যন্ত চিন্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রায়োগিক মনোবিদ্যার গবেষণার কথা আলোচনা করেছি। তাতে দেখাবার চেষ্টা করেছি, প্রায়োগিক বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক মত নিরূপণে যথেষ্ট বিভিন্নতা থাকলেও গবেষণার প্রগতি কোন সময়েই রুদ্ধ হয় নি। একজনের চিন্তাধারাকে আশ্রয় ক'রে কোনও নতুন প্রায়োগিক বা বৈশ্লেষনিক বা ব্যাখ্যাগত পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এই গবেষণায় জন্মত্ব বজায় রেখে গেছেন। অটো সেল্‌জের গবেষণা যে পর্যায়ে শেষ হয়েছে গেস্টাল্ট্ চিন্তাধারা সেখান থেকেই শুরু হয়েছে, যদিও এই শেষ বা শুরুর কোনও সাময়িক বা ঐচ্ছিক সূত্র দেখতে পাওয়া যায় না।

গেস্টাল্ট্ (gestalt) কথাটি জার্মানীয়। বাংলায় এর অর্থ হ'ল সমগ্রতা (wholeness)। ফ্রাঁক্‌ফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন পদার্থবিদ্যা ও শারীরবৃত্তে বিশেষজ্ঞ মনোবিদ্ কতকগুলি গবেষণা শুরু করেন যার উপর নির্ভর ক'রে তাঁরা দেখালেন কোনও মানসিক প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মত মৌলিক পদার্থে বিশ্লেষণ ক'রে ব্যাখ্যা করা মুখ্যতঃ প্রায়োগিক কৃত্রিমতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে মানুষের মনন একটি ক্রিয়া ; সেই মানসিক ক্রিয়াকে বৈশ্লেষণিক মৌলিকত্বে কল্পনা করার পিছনে যত যুক্তিই থাকুক, তার দ্বারা কখনই কোনও গতীয়-প্রক্রিয়ার যথার্থরূপ জানা সম্ভব নয়। কোনও গতিকে ব্যাখ্যা করতে হ'লে অঙ্গাঙ্গীরূপে দেশ (space) ও কালের (time) সূত্রোয়িত যুক্তির মাধ্যমেই প্রকাশ করা উচিত। কেবলমাত্র দেশ-এর বিভিন্ন পরিচয়ে এবং কাল-এর একটি ছেদ্যরূপ দিয়ে কোনও গতি বা ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করলে তার জন্মত্ব কখনই যথেষ্টরূপে জানা সম্ভব হয় না। আর ঠিক সেই কারণেই যে কোনও মানসিক ক্রিয়াকে সমগ্ররূপে কল্পনা ক'রে সেই অনুযায়ী গবেষণা করা উচিত। যখন কোনও উদ্দীপন-প্রভাবে কোনও মানসিক-ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সেটি একটি অদ্বিতীয় প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়াটিকে বিভিন্ন মৌলিকত্বে বিশ্লেষণ করলে মানসিক পরিচয়ে তা কখনই সেই অদ্বিতীয় মানসিক রূপকে প্রতিভাত করতে পারে না। কোনও একটি সুতানকে (melody) বিভিন্ন সুরে (note) কল্পনা করা খুবই সম্ভব কিন্তু সেগুলি কোনও মতেই সেই সুতানটির পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব করে তুলবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই নির্দিষ্ট সুচিন্তিত মধ্যম প্রক্রিয়া (mediation process)টির যথাযথ সংস্থাপন হচ্ছে। তাই সুতানের পূর্ণ পরিচয়েই সঙ্গীতের মানসিক আবেদন ত কতকগুলি সুরের সমষ্টি মাত্র নয়। যে কোনও মানসিক প্রক্রিয়ার এই সমগ্র-ভাবটিকে জানার মধ্যেই গেস্টাল্ট্ মতবাদীদের গবেষণা শুরু হয়েছিল ১৯০৫ সাল থেকে যা প্রথম জানা যায় ১৯১২ সালে কুর্ট কফ্‌কা (Kurt Koffka) বিরচিত এক পুস্তকের মাধ্যমে।

চিন্তার প্রকৃতি নির্ণয়ে গেস্টাল্ট্ মতবাদের অবদান খুবই সুচিন্তিত। এই মতবাদের প্রথম কথা হ'ল মানসিক প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে প্রত্যক্ষজ বিষয় আর সেই সম্বন্ধে জানা। কোনো ভৌতিক

* মনোবিদ্যা-বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শক্তির (physical energy) যথাযথ সংস্পর্শে মানস স্নায়বিক সঞ্চরণে সৃষ্টি হয় সেই বিষয়ের যথাযথ প্রত্যক্ষ। ভৌতিক শক্তিটির প্রকৃতি অনুযায়ী কোন সময়ে পারস্পরিক গতীয় মিথষ্ক্রিয়া (dynamic interaction) এবং তৎকালীন স্মৃতি-সহায়ের (memonic fraces) অবস্থান প্রভাবে সেই প্রত্যক্ষের মধ্যে একটি নতুন সংস্থাপনের সূচনা হয়। এটিকে তখন কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ বলেই ক্ষান্ত হওয়া যায় না, সেই প্রত্যক্ষটি সমস্যা আকারে প্রতিভাত হয়। একবার উদ্দীপ্ত হ'লে মানস স্নায়বিক (psycho-neural) প্রক্রিয়ার ধর্মই হ'ল কোনও না কোনও ভাবে একটি শেষ পর্যায়ে নিয়ে আসা। তাই প্রত্যক্ষের রূপান্তরে সমস্যার সৃষ্টি হ'লে যতক্ষণ না তার সমাধান হয় ততক্ষণ মানস-স্নায়বিক প্রক্রিয়ায় এক বিশেষ সঞ্চরণ হতে থাকে, আর তারই অধ্যাত্মীয় রূপ হ'ল চিন্তা। গেস্টাল্ট্ মতানুযায়ী প্রত্যক্ষ থেকে সমস্যা সমাধান পর্যন্ত যে মানসিক প্রক্রিয়া হয় তা' একই মানসিক প্রক্রিয়ার অবিচ্ছিন্ন ধারা। এর মধ্যে যে পর্যায়গুলি অনুভূত হয় সেগুলি আত্মনিয়ামক রীতির (self-regulating system) দমকমুক্ত হওয়ারই এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এই বিশ্লেষণের সাহায্যে তাঁরা দেখালেন প্রত্যক্ষ-প্রণালী এবং চিন্তা-প্রণালীর প্রক্রিয়া মূলতঃ একই ; তবে চিন্তা-প্রণালী প্রত্যক্ষ-প্রণালী অপেক্ষা অনেকখানি মুক্ত কারণ চিন্তাকে প্রত্যক্ষের ন্যায় অহরহ পারিপার্শ্বিক শক্তির চাহিদা অনুযায়ী আপন প্রকৃতিকে উপযোজিত করতে হয় না।

কোহ্‌লার (kiihlar) বর্ণিত একটি সুন্দর পর্যবেক্ষণে উপরে বর্ণিত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণটি বেশ বোঝা যায়। একবছর তিনমাসের একটি ছোট্ট শিশুকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ল। তার সামনে প্রায় ৬ ফুট দূরে একটি মনোহর জিনিসকে রাখা হ'ল—জিনিসটি এত সুন্দর যে শিশুটি সেটি নেবার জন্য বেশ জেদ আরম্ভ করল। জিনিসটি এবং শিশুটির মাঝে একটা শক্ত কাঁচের বেড়া, তার পাশ দিয়ে যাওয়া আসার রাস্তা হিসাবে একটি সরু গলি ;—শিশুটিকে জিনিসটি দেখিয়ে ছেড়ে দেওয়া মাত্র সে দৌড়ে সোজা যেতে গিয়ে কাঁচের গায়ে বাধা পেল, উঠে দাঁড়িয়ে একবার জিনিসটি, একবার এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ হেসে উঠেই সরু গলিটা দিয়ে গিয়ে জিনিসটি হস্তগত করল। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, শিশুটির মনে বেড়ার গায়ে ধাক্কা খেয়ে একটি নির্দিষ্ট প্রত্যক্ষজ ক্রিয়া বীথির (perceptual motor system) সৃষ্টি হ'ল, যার কতকগুলি অংশে একটি বিশেষ ধরণের দমকের সূত্রপাত। শিশুটি যা' চাইছে বেড়াটি থাকার জন্য তা পাচ্ছে না—কিন্তু পেতে তাকে হবেই। কিন্তু কী ক'রে ? এইখানে প্রত্যক্ষটি সমস্যার রূপ নিল এবং মানস-স্নায়বিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হ'ল এমন এক সমজাত (isomorphic) প্রক্রিয়া যার মূল কথাটি হ'ল সমস্যা দ্বন্দ্বটির যথাযথ সমাধান করা। যখনই মানস-স্নায়বিক স্তরে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, জৈবিক ধর্ম অনুযায়ী সেই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি স্থান থেকে সরে আসাটাই প্রধান কর্তব্য। শিশুটিও বাধা পেয়ে বেড়াটির ডানদিক-বাঁদিক তাকিয়ে অস্থির হয়ে উঠল, হঠাৎ সে একদিকে গলিটির অবস্থান বুঝতে পারলে। এই নতুন দৃষ্টটি তার তখনকার প্রত্যক্ষজ ক্ষেত্রের মধ্যে এক পরিবর্তনের সৃষ্টি করল—এই সৃষ্টিটি সম্ভব হ'ল তখনই যখন 'ঐ গলিটি দিয়ে ওদিকে যাওয়া যাবে এবং তার জন্যে ঐ জিনিসটা পাব'—এই রকম এক নির্দিষ্ট মানস ভাব সৃষ্টি এবং এর ফলে যে ঐ নির্দিষ্ট মানস-স্নায়বিক দ্বন্দ্বের অবসান হবে এইরকম এক পরিজ্ঞানের (insight) উদয়।

এই পরিজ্ঞান, গেস্টাল্ট্ মতবাদের মূল কথা। "পরিজ্ঞান হচ্ছে প্রাসঙ্গিক কোনও ঘটনা বা সামগ্রিক কোনও মানস-ক্ষেত্র সৃষ্টির প্রয়াসে আমাদের নিশ্চিত সংকল্পের অনুভূতি" (Insight is our experience of definite determination in a context, an event or devolopment of

the total field)। কোনও কোনও সময়ে কোনও নূতন মানস-ক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য পরিজ্ঞান-অনুভূতির প্রয়োজন নাও হ'তে পারে। এটি সম্ভব হয় তখনই যখন ক্ষেত্রটির বিভিন্ন পর্যায়, প্রতিন্যাস, সামগ্রিকতা ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট আদর্শের পরিপূরক হয়।

এই ধরণের বহু গবেষণার মধ্য দিয়ে গেস্টাল্‌ট্ মতবাদীরা দেখাতে চাইলেন চিন্তার বিষয়বস্তু সাধারণতঃ অভিনব। কারণ প্রত্যক্ষজ একটি নতুন গেস্টাল্‌ট্ সৃষ্টি না হলে সমস্যা বা তার সমাধানের প্রশ্ন আসে না—আর নতুন গেস্টাল্‌ট্ সৃষ্টি তখনই সম্ভব হয় যখন পুরানো অযুক্ত অনুভূতিগুলিকে একটি যুগ্মতায় বাঁধার চেষ্টা হয়। যেমন ভাবে কেবল স্বরসমষ্টি স্বতান নয় ঠিক সেইরকম ভাবেই অযুক্ত অনুভূতির যুগ্মতায় উৎপন্ন আর এক অনুভূতি সেই অযুক্ত অনুভূতি নয়। যুগ্মতার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় সামগ্রিক চেতনা যার সঙ্গে পূর্বতন মৌলিক চেতনার অনুভূতিগত কোনই সাদৃশ্য থাকে না। এই বিচারে, গেস্টাল্‌ট্ মতবাদ মুখ্যতঃ চিন্তার সার্গিক (creative) প্রকৃতির কথাই আলোচনা করেছেন। আনুষঙ্গবাদীদের আলোচনার মাধ্যমে চিন্তার প্রতিফলনজনিত প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়; গেস্টাল্‌ট্ মতবাদ প্রমাণ করল চিন্তার প্রকৃতি পুরাতন অনুষঙ্গ নয়—নতুনত্বের সৃষ্টি প্রয়াস।

অনুষঙ্গবাদীদের সঙ্গে ঊর্জ্জবার্গ-গবেষকদের মূল পার্থক্য পূর্বের প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনায় একটি কথা প্রকট হয়েছে : ঊর্জ্জবার্গ দল যে নিয়তিবাদের (determining tendency) পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে চিন্তা-প্রণালীর দিক্-প্রত্যয়ের অবতারণা আছে। চিন্তার প্রকৃতি নির্ণয়ে গেস্টাল্‌ট্ মতবাদীরা এই অবদানটিকে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা নিয়তিবাদকে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁদের মতে সমস্যা প্রত্যক্ষে মানস-স্নায়বিক স্তরে যে দমক্ দেখা দেয় তাকে আত্মোপযোগী ক'রে তোলার জন্য দিক্-প্রত্যয়ের প্রয়োজন। সমস্যা প্রত্যক্ষে মানস-স্নায়বিক স্তরের মিথস্ক্রিয়াগুলির সংহত বলই (resultant force) এর নিয়ামক। এগুলির প্রধান জৈবিক এবং মানসিক রূপ হ'ল মানস স্নায়বিক স্তরে সুস্থিতি (equilibrium) আনার প্রচেষ্টা।

এ সম্পর্কে গেস্টাল্‌ট্ মতবাদীরা, বিশেষ ক'রে অধ্যাপক কোহলার অনেক পরীক্ষা করেছেন। তিনি ষোলটি ক্রমপর্যায়ী-পরিস্থিতিতে এক্ জাতীয় বানরের (chimpangee) ওপর নানারকম সমস্যা সমাধানের পরীক্ষা করেছেন। একটি গাছের ডাল থেকে তিনি এক ঝুড়ি ফল দড়ি দিয়ে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিলেন যাতে ওটা পেতে হ'লে যেমন করেই হোক দড়িটিকে ডাল থেকে খুলতে হ'বে। মাটি থেকে ঝুড়িটি বেশ কিছুটা উঁচুতে রাখা হ'ল, অবশ্য এর জন্য কোহলার একটি পাটাতনও কাছাকাছি রেখেছিলেন যার উপর দাঁড়িয়ে ঝুড়িটির নাগাল পাওয়া যাবে। তিনটি ক্ষুধার্ত বানরকে এই পরিস্থিতিতে তিনি ছেড়ে দিলেন। প্রথমটি ঝুড়িটি দেখেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই ঝুড়িটি পাবার জন্য লাফালাফি শুরু ক'রে দিল। দ্বিতীয় বানরটি গাছে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল; আর তৃতীয়টি এদিক-ওদিক তাকিয়ে নানা চেষ্টার পর হঠাৎ পাটাতনটির উপর উঠে এক লাফে ঝুড়িটি ধ'রে ঝুলে পড়ল। আর তার ফলে দড়ি ছিঁড়ে ঝুড়িটি তার করায়ত্ত হ'ল। সে-ই একমাত্র এই সমস্যাটিকে সমাধান করতে সফল হ'য়। দ্বিতীয় পরীক্ষাটিতে—একটি ফল খাঁচার মধ্যে রেখে তার সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে তার আগাটিকে বাইরে রাখা হ'ল। সেই রকম আরও খানিকটা দড়ি তারই আশে-পাশে সেইরকম ভাবে ছাড়ান রইল। বানরটি ফলটিকে পাবার জন্য চেষ্টা শুরু করল, অন্ধ প্রচেষ্টায় সেটিকে না পেয়ে দড়িগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। আসল দড়িটিকে নাড়ানাড়ি করতে করতে এক সময়ে হঠাৎ লক্ষ্য করল ফলটাও নড়ছে। তখন

ফলটা পেতে তার আর কোনও অসুবিধা হ'ল না। তৃতীয় পরীক্ষাটিতে দড়ির বদলে একটি মাপসই লাঠি ব্যবহার করা হ'ল।

এই সমস্ত পরীক্ষায় একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়—দড়ি, লাঠি, পাটাতন ইত্যাদি জিনিসগুলি সমস্যা সমাধানের পথে একটি বিশেষ কার্মিক মূল্যের পরিচয় বহন করে। এগুলির মত অন্য কোন জিনিসেও একই পরিস্থিতিতে এই মূল্য আরোপিত হয়; যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে তাদের মৌলিক প্রয়োজন অন্য কোনও ক্ষেত্রে। অবশ্য এই সমস্যা সমাধান কখনই সম্ভব হ'বে না যে পর্যন্ত না ঐ 'দড়ি' বা 'লাঠির' সঙ্গে 'ফল'টির সম্পর্ক সম্বন্ধে মনে এক পরিজ্ঞান সৃষ্টি হচ্ছে। এটিকে বলা হয়েছে সম্পর্কায়িত সংসাধকের স্থাপন (location of the related implements)। আজকের বিচারে, ঊর্জ্জবার্গ সম্প্রদায়ের দিক্-প্রত্যয় এবং গেস্টাল্‌ট্ সম্প্রদায়ের স্থাপন-নির্দেশ এর মধ্যে মূল পার্থক্য বিশেষ নেই। "সমাধানের কোনও একটি অংশ যদি সেই অংশ মাত্রের পরিচয়েই বিচার্য হ'য়ে দাঁড়ায় তবে তা' এমন একটি চেষ্টিতের (behaviour) রূপ প্রকাশ করবে যা হবে সম্পূর্ণ অসংশ্লিষ্ট অথবা বিপরীতধর্মী। একমাত্র যদি সম্পূর্ণভাবে কোনও পরীক্ষার ব্যবহারগুলি আয়ত্তাধীন হয় তবেই সামগ্রিকরূপে প্রতিটি অংশের অর্থ বোধগম্য হ'বে।" চিন্তার পরিচয়ও এই। তবে অনেক সময়ে চিন্তার সমগ্র-রূপ বা কোনও একটি নির্দিষ্ট চিন্তা প্রক্রিয়ার অর্থ হঠাৎ বোঝা যায় না—কিন্তু সমস্যাটি সমাধানের পর ঐ নির্দিষ্ট পথটি কেন অবলম্বন করা বা করতে হয়েছিল তার কথা বেশ বুঝতে পারা যায়। কোহ্‌লার ১২টি পরীক্ষার মাধ্যমে তাত্ত্বিক বিচারের এই স্তরে পৌঁছেছিলেন। বাকী চারটি পরীক্ষা করেছিলেন এর খুঁটিনাটি বিষয়গুলির বিশ্লেষণে যার আলোচনা বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক না হ'লেও প্রবন্ধটি দীর্ঘায়ন দোষে দুষ্ট হ'য়ে পড়বে।

ওপরের পরীক্ষাগুলির মানস-স্নায়বিক ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যেতে পারে—কোনও একটি প্রাণীকে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তার কাম্য বস্তুটির সামনে উপস্থিত করা হ'ল। শারীরবৃত্তির মতানুযায়ী এই প্রত্যক্ষে তার গ্রাহক—বহিস্তর মস্তিষ্ক ক্ষেত্রে (receptor contical field) অন্যান্য 'ফল' এর সঙ্গে বিকল্পতার সৃষ্টির মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেরুতা (polority) প্রভাবে, বস্তুটির দিকে বিচলন শুরু হ'ল। বাইরের কোনও পরিস্থিতি প্রভাবে এই গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তারই প্রভাবে বহিস্তর মস্তিষ্ক ক্ষেত্রে একটি পুনর-সংগঠনের পালা চলে। তখন কাম্যবস্তু-গতি-পাওয়া এই সরল সূত্রটিকে পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়; চাওয়া এবং পাওয়ার জন্য প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও সূত্রের সন্ধান করতে হয় যার জন্য অপ্রত্যক্ষ গতি-মাধ্যমে কাম্য বস্তুটিকে পাওয়া যেতে পারে। গেষ্টালট্ মতবাদীদের মধ্যে এই প্রক্রিয়াটি হ'ল পরিজ্ঞান সৃষ্টি আর এরই সূত্রে অপ্রত্যক্ষ এবং অসম্পর্কিত বস্তু বা কর্ম সমগ্রতার বিচারে কার্মীক মূল্য লাভ করে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সম্পর্কায়িত পরিজ্ঞান সৃষ্টি না হ'লে সমস্যা সমাধানের আশা করা বৃথা।

পরবর্তী যুগে নির্জ্ঞান মনের গবেষণা ও তথ্য উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে গেস্টাল্‌ট্ মতবাদকে কয়েকটি দুরূহ প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হ'ল; যে সম্বন্ধে তারা নিজেরা কোন আলোকপাতই এতদিন করতে সক্ষম হন নি। দার্শনিক বিচারে, বিশেষতঃ হোয়াইট হেডের আপেক্ষিক তত্ত্বের মাধ্যমে দেখা যায়, মানুষের একই কাজের পুনরাবৃত্তির মধ্যে প্রতিবারই কিছু নতুনত্ব থাকে। প্রশ্ন হ'ল—এই নতুনত্বের পরিচয় কি সবটাই প্রত্যক্ষজ? অথবা কোনও পুরাতনের সঙ্গে পরিবর্তনশীল বাস্তবের মিথস্ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন যে ভাব, সেইটিই? অবশ্য এটি অনুষঙ্গবাদীদের সরল নৈয়ায়িক বিচারের ব্যবহার নয়, এর মধ্যে আছে ব্যক্তি মানসের এক প্রাচয়িকতা। প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে এর উত্তর পাব, এর বীজ লুকিয়ে

আছে মানুষের মনের গভীরতম প্রদেশে এক প্রতীকভাবে যার সজ্ঞান পরিচয় হ'ল গেস্টাল্‌ট্‌বাদীদের অভিনবত্ব। এর তাত্ত্বিক পরিচয় গেস্টাল্‌ট্‌ মতবাদ দিতে পারেন নি, তাঁরা এর বিশ্লেষণ করতে গিয়েছিলেন শারীরবৃত্তের পরিদিতে এবং সেইখানেই তাঁরা পরাজিত।

গেস্টাল্‌ট্‌ মতবাদের পরিজ্ঞান সৃষ্টি সমস্যা সমাধানের কারণ না হয়ে দেখানো যেতে পারে এটি একটি শেষ পর্যায়ী মানস-অবদান। আজকের লক্ষ্যর পথে বাধাপ্রাপ্ত হ'লে বক্রগমনের প্রয়োজন হয় কেন? যে ধারণা প্রত্যক্ষ এবং লক্ষ্যর মাধ্যম রচনা করে তার শেষ পরিচয় হয়তো পরিজ্ঞান কিন্তু বিভিন্ন মানুষের চিন্তায় একই ধরণের পরিজ্ঞান কি সেই একই লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করে? কফ্‌কার পরবর্তী রচনায় এই প্রশ্নের জবাব দেবার প্রয়াস দেখা যায়। সেখানে তিনি মানুষের অস্তিতাকে অস্বীকার করতে পারেন নি, তাই তিনি এর ব্যাখ্যায় মানুষের অহংবোধের কথা তুলেছেন। বর্তমানে অহংবোধের পরিচয়-রূপ অনেকখানি জানা গেছে এবং সেই সূত্রে গেস্টাল্‌ট্‌ মতবাদের তাত্ত্বিক মূল্যও কমে গেছে।

আর একটি বিচারে, গেস্টাল্‌ট্‌ মতবাদ চিন্তার কার্মিক রূপের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষর মূল অবদানের সঙ্গে কোনও লক্ষ্যর সমস্যা-সমাধান-প্রক্রিয়ার যে আঙ্গিকতা সৃষ্টি করতে চেয়েছে তার মধ্যে প্রেষণার স্থান অত্যন্ত সাধারণ রূপেই কল্পনা করা হয়েছে। স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন করা উচিত—সমস্যা দেখা দিলেই তা' সমাধান করতেই হবে কেন? অবশ্য তার শারীরবৃত্তিয় রূপ দেখানো হয়েছে, কিন্তু সেই চিন্তা ক্রমাঘয়ে অবিচলিত থাকবে কেন? সকল সময়ে সমস্যার সমাধান হয় না এবং যখন হয় না, তখন চিন্তাটি কি রূপ নেয়? বর্তমানে এগুলি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে, তারই ফল স্বরূপ চিন্তাকে এখন সমগ্র অস্তিতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করতে হবে। কেবলমাত্র জ্ঞানক্ষেত্রের (cognitive field) মাধ্যমে চিন্তার প্রকৃতিকে বিচার করতে বসলে একদেশদর্শীতারই প্রমাণ দেওয়া হ'বে।

এই সমস্ত অংশের বিচারে আসছে বারে মনঃসমীক্ষণ মতবাদ, চিন্তাকে কী পর্যায়ে বিশ্লেষণ করেছেন তা' আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

সুখ-দুঃখ ও বাস্তব

॥ চার ॥

তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি. এস্‌সি*

সুখ, দুঃখ, বাস্তব ইত্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকদিগের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা বাদ দিয়া আমরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে এ সম্বন্ধে কী বুঝি এবং আমাদের মনে এই সুখ দুঃখ বাস্তব কীরূপে দেখা দেয়, অর্থাৎ এই সকল অনুভূতি সম্বন্ধে আমাদের মনের কী স্বভাব, সে-সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

ফ্রয়েড মনের যে দুইটি সূত্র মানিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি হইল মনের সুখ-দুঃখ সূত্র (pleasure-pain principle) অর্থাৎ মনের স্বভাব হইল দুঃখকে বাদ দিয়া সুখের পথে চলা, সুখ ভোগ করা, সুখের কামনা করা ইত্যাদি। এক কথায় মন আমাদের সুখের সন্ধানে চলে, সুখই তাহার কাম্য। তাই দুঃখকে পরিহার করাও তাহার স্বভাব। আর মনের অপর সূত্রটিকে তিনি বাস্তব সূত্র (reality principle) নাম দিয়াছেন। এই সূত্র আমাদের মনের আর এক স্বভাব। ইহার ফলে আমরা বাস্তবকে মানিতে পারি। তাহা না হইলে বাস্তব জগৎকে আমাদের মন মানিতে পারিত না। সে সম্বন্ধে তাহার কোনও ধারণাই জন্মাইতে পারিত না।

শিশুর জন্ম-পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আজও জানিতে পারা যায় নাই। জন্মের পর হইতেই শিশুকে বহির্জগতের নানা বস্তু ও অবস্থার বারে বারে সম্মুখীন হইতে হয়। এই বাস্তবকে বুঝিবার ক্ষমতা না থাকিলে জীবন ধারণ করাই সম্ভব হইত না। কিন্তু আমরা বাঁচিতে চাহিবই বা কেন? সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর বাঁচিবার ইচ্ছা কিছু থাকে কি না বোঝা কঠিন। অন্ততঃ মনের এমন এক শক্তি তাহার থাকে যাহা পরে বাঁচিবার ইচ্ছায় রূপান্তরিত হইতে পারে। প্রথম অবস্থায় পারিপার্শ্বিকের আমূল পরিবর্তন শিশুর নিকট প্রীতিপ্রদ হয় না। এ কথা পূর্বে এক প্রবন্ধে বলিয়াছি। এখানে সে সম্বন্ধে আর পুনরুক্তি করিব না। যাহা প্রথমে তাহার নিকট সুখকর হয় নাই তাহার সম্বন্ধে সে দেহের অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া বা কাঁদিয়া বাক্ত করে। ভাল লাগে না বলিয়াই তাহার এই প্রতিবাদ। মা বা বড়দের অভিজ্ঞতা তখন তাহার সুখের ব্যবস্থা করিবার সহায়ক হয়। চোখে বেশী আলো লাগিলে শিশুর সুখে ঘুমাইয়া থাকার পক্ষে বাধা হয়। সে জন্য তাহার যে সব অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় তাহা দেখিয়া মা তাহার সেই বেশী আলো লাগার অসুবিধা দূর করিয়া দেন। ঠাণ্ডা, গরম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি সব বিষয়ই এই একই নিয়মে শিশুর অসুবিধা দূর হয়। ক্রমে সে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারে কোথা হইতে এবং কিসের জন্য তাহার কোথায় কী দুঃখ বোধ হইতেছে এবং কী করিয়া তাহার সে দুঃখ কষ্ট দূর হইতে পারে। সেই সঙ্গে বাস্তবের নানান্ অবস্থায় পড়িয়া এ শিক্ষাও তাহার হয় যে ইচ্ছা করিলেই সকল কষ্টবা দুঃখ তখনই দূর করা যায় না। এমনকি এমন দুঃখও আছে যাহা দূর করা হয়তো আদৌ সম্ভব নয়। আমার দাঁতে যন্ত্রনা হইলে সে যন্ত্রণা আমি অবিলম্বে দূর করিতে চাই, কিন্তু চাহিলেই যে তাহা সকল অবস্থায় সত্বর দূর করিতে

* লুম্বিনি পার্ক হাসপাতালের অধিকর্মী। ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির সচিব। মনঃসমীক্ষক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা-বিভাগের অবৈতনিক উপাধ্যায়।

পারি এমন নয়। তখন সে-যন্ত্রণা দুঃসহ হইলেও সহিতে হয়। ভবিষ্যতের সুখের আশায় আমরা বর্তমানের দুঃখকে এইভাবেই সহিতে পারি। দেহের যে-যন্ত্রণা কখনই আর দূর করা যাইবে না বলিয়া জানিতে পারি এবং সে-যন্ত্রণা যদি এমন হয় যে জীবনের কোনও সুখই ভোগ করিতে পারি না, তখন আর বাঁচিয়া থাকিতেই চাই না। এমন অবস্থায় আমরা অনেক সময় মৃত্যুই কাম্যবান—"মরতে পারিলেই বাঁচি" ইত্যাদি বলিয়া থাকি। কিন্তু তাহার চেয়েও বড় কথা এই যে, মনের এমন এক সুখের প্রতি মোহ আছে এবং সে-মোহ সাধারণতঃ এতই প্রবল থাকে যে অনিবার্য হইলেও বা কোনও দুঃখ দূর করা অসম্ভব হইলেও মন তাহা মানিতে চায় না। অনেক কিছু করিয়া ফল না পাইলেও মন ধরিয়া লইতে চায় যেন আরও কিছু উপায় আছে যাহাতে দুঃখ দূর হইবে। সেই কাল্পনিক সুখের আশায় আমরা বর্তমানের দুঃখ সহিতে পারি। এই সুখ বা সুখের কল্পনা আমার বাঁচিবার ইচ্ছা জাগাইয়া রাখে। কোনও অবস্থায় অসহনীয় দুঃখই যদি মনের একমাত্র প্রাপ্য হয় তবে বাঁচিবার ইচ্ছা আর থাকে না।

মনের কাছে সুখ ও দুঃখ পৃথক অনুভূতি। দুঃখের অনুভূতি যখন আমার নাই তখনই যে আমি সুখ বোধ করিতেছি তাহা সত্য নহে। সুখ একটা বিশেষ অনুভূতি, তাহা দুঃখের অভাব মাত্র নহে। হিন্দুদিগের সাংখ্য দর্শনের প্রথম প্রশ্ন হইয়াছে দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি কী উপায়ে হয়। কিন্তু ইহা হইতেও সুখের স্বাদ পাওয়া যায় না, সুখী হওয়া যায় না। আবার তাই বলিয়া রাশি সুখ মনের একরকম বিশেষ অনুভূতি। ইহা দুঃখের অভাব অবস্থা মাত্র নহে।

এই পর্যন্ত লিখিয়া কেমন মনে হইতেছে এ ভাবে লিখিয়া যেন সুখ পাইতেছি না। কেন? কী হইলে তবে সুখ হইবে? কিসে আমাদের সুখ হয়? ভাল খাইতে পারিলে, থাকিতে পারিলে, পড়িতে পারিলে সুখ হয়। ভাল গানবাজনা শুনিলে সুখ হয়, প্রিয়জনের দেখা পাইলে, সঙ্গি পাইলে সুখ হয়। আবার সুখের দৃশ্য দেখিয়া সুখ হয়। পরীক্ষা পাশ করিয়া, খেলায় জয়লাভ করিয়া সুখ হয়। সুনাম, সম্মান পাইলে সুখ হয়। শরীরের আরাম পাইলে সুখ হয়, কিছু গড়িতে পারিলে, সৃষ্টি করিতে পারিলে অন্যের প্রশংসা পাইলে ইত্যাদি কত করিলেই তো আমাদের সুখ হয়। কিসে সুখ হয় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কি তবে সম্ভব?

এই দৃষ্টিতে দেখিলে সত্যই সুখের হদিশ পাওয়া প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। নানান্ অবস্থা, নানান্ উপকরণ হইতেই তো সুখ পাই। তবে? এ প্রশ্নের কিছু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

বলিয়াছি ভাল খাদ্য পাইলে সুখী হই। প্রশ্ন উঠে নাকি, ভাল খাদ্য কোনটাকে বলিব? সে বিচার ব্যক্তি বিশেষের। আমি লেংড়া আম ভাল মনে করি কিন্তু আমার পরিচিত একজন আম আদৌ খাইতে পারেন না। আম তাঁহার মতে অখাদ্য। এখানে আমের স্বাদ ভাল লাগিতে হইবে এবং সেই স্বাদ ভোগ করিবার ইচ্ছা থাকিতে হইবে তবেই আম পাইলে আমি সুখী হইব। আমার যে বিষয়, বস্তু বা অবস্থা সম্বন্ধে মনে চাহিদা নাই অর্থাৎ পাওয়ার ইচ্ছা নাই সে বস্তু ইত্যাদি পাইলে আমি সুখী হই না। আমার মনের চাহিদা যাহা মিটাইতে পারে তাহাই আমার ভাল লাগে আর সেই ভাল লাগাতেই আমার ইচ্ছার পূরণ হয় এবং তাহাতেই সুখ অনুভব করি। সুতরাং সুখ পাইতে হইলে কোনও কিছু সম্বন্ধে আমার একটা ইচ্ছা থাকিতে হইবে এবং সে ইচ্ছা পূরণ হইতে হইবে, তবেই আমার সুখ হইবে। যেখানে সে ইচ্ছা পূরণ হইতে পারে না সেখানে সাধারণতঃ আমাদের সে বিষয়ের সুখ হয় না। অতি সাধারণ সহজ অবস্থার সুখের সম্বন্ধে এই উক্তি সত্য। মূলতঃ এই উক্তি সকল সুখ

সম্বন্ধে সত্য কিনা সে-বিচার পরে অন্য প্রবন্ধে করিবার ইচ্ছা রহিল। এ বিষয়ে আলোচনা করিলে বহু জটিলতা দেখা দিবে এবং নির্দিষ্ট কোনও মতবাদে পৌঁছিবার জন্য এ সমস্ত জটিল সমস্যার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন হইবে। প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধির ভয় ও সময়ের অভাব হেতু এবারকার মতো বিস্তৃত আলোচনা স্থগিত রাখিতে হইল।

সুখ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত সূচনা ইঙ্গিত দেওয়া হইল তাহা হইতে যে দুইটি কথা মনে জাগিতে পারে তাহার উত্তর অতি সংক্ষেপেই উল্লেখমাত্র করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

বলিয়াছি ইচ্ছার পরিপূরণ হইতে সুখ হয়। তাহা হইলে যে বিষয় সম্বন্ধে আমার কোনও ইচ্ছা নাই সে বিষয় সম্বন্ধে আমার সুখ পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। এই দৃষ্টিতে দেখিলে মন ভোগবৃত বলিয়া মানিতে হয়। ভোগ করিবার বৃত্তি হইতেই ইচ্ছার সৃষ্টি। ইচ্ছা যখন মনে জাগে তাহা পূরণ করিবার তাগিদ মনে দেখা দেয়। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে এই ইচ্ছা না মিটাইতে পারিলে মনে যে চাপা অস্বস্তি হয় তাহারই প্রবলতার উপর আমাদের দুঃখ বোধ জাগে। ইচ্ছা যত তীব্র হয় তাহার ব্যর্থতাও তত দুঃখকর হয় ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বাস্তব জীবনে ইচ্ছা অনেক সময়ই সোজা পথে পূর্ণ হয় না। নানান্ বাধাবিপত্তি এড়াইয়া নানান্ জটিল পথ খুঁজিয়া লইয়া মন আপন ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে। সেই সমস্ত জটিল পথে চলার বাধা যে সকল ক্ষেত্রেই দুঃখকর তাহাও নহে। এমন অনেক অবস্থা আছে যেখানে ইচ্ছার বিলম্বিত পরিপূরণে সুখ বেশী হয়। ছোট ছেলেদের আচার-খাওয়ার কথাটা এইরকম সুখ ভোগ করার উদাহরণ হিসাবে অতি সহজেই মনে আসে। আচার-খাওয়ার ইচ্ছা হইলে আচার পাওয়া মাত্র তাহা মুখে পুরিয়া দিয়া সুখ ভোগ করাই তো স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিশু সে আচার হাতে রাখিয়া একটু একটু করিয়া চাটিয়া খাইতে বেশী পছন্দ করে। এ ক্ষেত্রে তাহার আচার-খাওয়ার ইচ্ছা তীব্র নয় এ কথা মনে করিলে ভুল করা হইবে। তাহার এই আচার-খাওয়ার ইচ্ছার সঙ্গে আরও যে সকল ইচ্ছা মিলিত হইয়া ঐ প্রধান ইচ্ছাটি সহজভাবে পূর্ণ হইবার পথে জটিলতা সৃষ্টি করিয়া রূপান্তরিত করিয়াছে সে সম্বন্ধে আগামীবারে এবিষয় বিস্তৃত আলোচনার সঙ্গে বলিতে চেষ্টা করিব।

চরিত্র বিচিত্রা

উদয়চাঁদ পাঠক

(২)

রবিবার। হাতে কাজকর্ম নেই। ছেলে পড়ানোর তাগিদ নেই। দুপুর না হতেই, অর্থাৎ ১২টা না বাজতেই যে যার মতো শুয়ে ঘুমোচ্ছে। গতরাত্রে বলেছিলাম কাল একটু বেলায় যাব, রবিবার আছে, তুমিও তো ভালমন্দ কিছু রাঁধবে। ভেবেছিলাম তন্দ্রার ঘোরে হয়তো রাজি হয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় কি? শুনে গৃহিণী চমকে উঠলেন যেন। বললেন "হ্যাঁ, ঐ ক'রে শরীরটাকে শেষ করবে, না হলে আমায় হাড়ে-হাড়ে জ্বালানো হবে কি ক'রে? ওসব হবে না। রোজকার সময় মতো নাওয়া-খাওয়া করতে হবে, না হলে হাতীও পড়ে যায় জান?" বিপরীত ফল হবার উপক্রম দেখে বলেছিলাম, "কিন্তু তোমার এটা সেটা খুসি মতো রেঁধে শেষ করতেও তো সময় লাগবে, তাড়াহুড়ো ক'রে লাভ কি? ভাল ভাল খেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।" উত্তর এল "আমি ঠিক সময়ের মধ্যে তোমার জন্যে যা খেতে চাও রেঁধে দেব দেখ। সময় মতো তুমি নিজে বাজারটা দেখে শুনে এনে দিও তবেই হবে।" আর কিছু না বলাই মঙ্গল মনে ক'রে চুপ করে গেলাম। কেবল দু একটা রুচিকর খাদ্যের নাম উল্লেখ করেছিলাম। রবিবার ১০টার মধ্যেই দেখি যে সব রান্না প্রস্তুত।

সারা দুপুর কী করা যায় তাই শুয়ে শুয়ে ভাবছি। ঘুম আসে না। দিনে ঘুমোবার অভ্যাস করবার সুযোগ জীবনে আজো আসে নি। দু একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মনে হল দুপুরে রবীন্দ্র সরোবরের গাছতলায় গিয়ে বসে জলের ঢেউ গুনে না হোক অন্ততঃ খোলা বাতাসে নির্জনে সময় কাটাতে পারা যাবে। বিকেলে সেখানে শৌখীন স্বাস্থ্য সন্ধন্ধকারীদের ভিড় জমবে, আরো কত রকমের লোক আসবে। নাঃ সেটা যেন আজ আর ভাল লাগবে না। চলেই আসবো তার আগে।

বাইরে তখন বাদল-ভাঙা রোদ প্রখর হয়ে উঠেছে। বাতাস গরম বইছে। ভাদ্র মাসটা আজও ভদ্র হতে পারলো না। তবু বেরিয়ে পড়লাম স্ত্রীর বাধা না শুনেই। ঠিক সময়েই ফিরে খাবো এ আশ্বাসটুকু পেয়ে তিনিও বিশেষ বাধা দেন নি।

বাস থেকে নেমে চলেছি রবীন্দ্র সরোবরের দিকে। পাশের একবাড়ী থেকে হঠাৎ চিৎকার—"ওরে বাবারে মেরে ফেলে দিলে, মেরে ফেলে দিলে। আর করবো না। ওমা আর মেরো না; ওরে ওরে মরে গেলাম, ওরে মা গো, পায়ে পড়ি। উঃ হু-হু-হু আর মেরো না, আর মেরো না, পায়ে ধরছি আর মেরো না……" এমন আর্তকণ্ঠে চিৎকার যেন আগে কখনো শুনিনি। বুকে কেমন একটা প্রবল ধাক্কা খেয়ে যেন আন্দোলন সুরু হয়ে গেল। কী ব্যাপার! এত মার! মা ছেলেকে মারছে, গলা শুনে নেহাৎ ছোট ছেলে বলে ত মনে হয় না! ৮।৯ বছর নিশ্চয়ই হবে। আগের ঘটনা কিছুই জানা নেই। ছেলেটার মায়ের গলা শুনতে পেলাম, ক্রুদ্ধ আস্ফালনে ফেটে পড়ছে "মর, তুই মর, এখুনি মর, হারামজাদা, হতভাগা ছেলে মর তুই মর মর মর" প্রহারের ধমকে ধমকে কথাগুলি বেরিয়ে আসছে। উচ্চারণগুলিও তাই কেমন যেন বিকৃত হয়ে ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে। ওদিকে ছেলেটি যেন সত্যি প্রাণের দায়ে তীব্র প্রহারের

বেগে বুক ভাঙা চিৎকার করছে। আর পা যেন চলে না। মনের বেগ আপনা হতেই এত প্রবল হয়ে উঠলো যে কখন বাড়ীটার দিকে এগিয়ে গেছি জানতেই পারিনি। অন্যায় করেছে ছেলে, তা না হয় করলো, কিন্তু তাই বলে মা হয়ে এভাবে মারবে! অসহ্য। আমার যেন দাঁতে দাঁত চেপে এলো। ইচ্ছে হল এখুনি জোর করে বাড়িতে ঢুকে ঐ রাক্ষুসী মা টাকে ধাক্কা দিয়ে এমন কি বেশ কিছু শিক্ষা দিয়ে ছেলেটাকে ওর হাত থেকে উদ্ধার করি। দুয়ার বন্ধ। অন্ধ আক্রোশে তখন আমার মনেও যেন অসংখ্য কাল-নাগ ফোঁস ফোঁস করছে। প্রতিকারের সব পথ বন্ধ। চঞ্চলতা নিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম ঠিক জানি না। এক সময় কানে এলো "এই ছাতু!" অনেক কালের ভুলে যাওয়া নামটা কানে আসতেই যেন আবার বাস্তবে ফিরে এলাম। তাকিয়ে দেখি যে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি তার পাশের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে "চিংগাড়ী"। খালি গায়ে, কোমরের কাপড় দুভাঁজ ক'রে জড়িয়ে সরু কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে। সবে আহার শেষ করে উঠেছে বোধ হয়।

প্রায় বিশ বছর আগেকার কথা। সবে পশ্চিম থেকে কলকাতায় এসেছি কলেজে পড়তে। বাংলা জানি না, এত বড় বিদেশী সহরে পরিচিত ২।১ জন যার নাম জানি তাদের ঠিকানা খুঁজে হদিস বের করা তখন অসম্ভব।

কলেজে ভর্তি হবার আগে একটা মেসে এসে উঠেছি। সেখানেই দেখা বারিনের সঙ্গে। প্রথম যে ঘরে থাকার ব্যবস্থা হ'ল সেই ঘরে সেও কদিন হ'ল আছে। এসেছে কলেজে পড়বে, ভর্তি হবে প্রেসিডেন্সী কলেজে, তারপর চলে যাবে হষ্টেলে। উদ্দেশ্য এক বলেই হোক বা অন্য কিছু কারণেই হোক, দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে সময় লাগেনি। আমাকে ডাকতো 'ছাতু'। অনেকদিন শোনবার পর একে ওকে জিজ্ঞাসা করে ওর নাম 'চিংড়ী' ঠিক করে ডাকতে গিয়ে বাংলা বুলিটা একটু নড়ে গিয়ে "চিংগাড়ী" হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে ঐ নামেই দুজনের নামাকরণ হয়ে গেল। কলেজে ভর্তি হলাম, হষ্টেলেও থাকলাম দুজনেই কিন্তু দুজনের পাঠ্যবিষয় ছিল আলাদা। তাতে কিছু যায় আসেনি, নাম দুটো বেঁচে রইল আর সেই সঙ্গে বন্ধুত্বটাও। কলেজ জীবন শেষ ক'রে যে যার জীবনীর অর্থাৎ রোজগারের খোঁজে কোথায় ছিটকে পড়লাম। প্রায় ১৫ বছর আর উভয়ের দেখাশোনা হয়নি। আজ হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে রবিবারের ভরা দুপুরে এক অতি রূঢ় পরিবেশের মধ্যে দুজনের দেখা হয়ে গেল। নিজের মনে তখনও আন্দোলন থামেনি। ডাক শুনে একটু বেশী উচ্চস্বরেই—"আরে, চিংগাড়ী!" বলে তার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। স্বাভাবিক প্রাথমিক আলাপ চলবার মধ্যে মধ্যে শুনতে পাচ্ছি পাশের বাড়ীর শাসন তখনো চলছে। একটু থামে আবার শুরু হয়। একবার বললাম—"ছেলেটাকে মেরেই ফেলবে ঐ রাক্ষুসীটা। এমন মা-ও হয়! বস্তির ব্যাপার যে হে।" ততক্ষণ ঘরে গিয়ে দুজনে বসেছি। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে তবু যেন গরম যায় না। উত্তেজনা না থামলে এ গরম যাবেও না। চিংগাড়ী বললে "এ তো লেগেই আছে। এক মহা অশান্তি জুটেছে। বছর খানেক হল ঐ ভাড়াটেরা এসে অবধি প্রায়ই ঐ কাণ্ড। দিন নেই রাত নেই হঠাৎ মারধর চিৎকার। কতবার ভদ্রলোককে বলেছি পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। ভদ্রলোক নিরুপায়। আমি তীব্র স্বরেই বলেছিলাম "নিরুপায়? তার মানে!" স্ত্রী ছেলেকে নৃসংশভাবে মারবেন আর তিনি বাপ হয়ে চুপ করে থাকবেন! এ যুগে অসম্ভব, স্ত্রী যদি পাগলই হয়ে থাকে তাকে পাগলা গারদে দেন না কেন! অন্যের অশান্তি করা আর বিশেষকরে ছেলেটার সর্বনাশ করতে দেওয়া এ অসহ্য, এ যুগে কিছুতে হতে পারে

না। তোমরা—" একদমে অনেক কথা বলে যাচ্ছিলাম। বন্ধু বাধা দিয়ে বললে "তুমি সব খবর জানো না বলেই বলছ। মা বাবাই বা কী করবে?" "কেন, করবে না-ই বা কেন? এইভাবে যা খুসি মা করবে আর তাই সয়ে যেতে হবে!" "তুমি জান না তাই বলছ, ছেলেটার খবর বলি শোন—" আমি উৎসুক হয়ে শুনতে বসলাম, কিন্তু মনে রইল একটা চাপা বিদ্রোহ—সন্তান শাসনের নামে বর্বরতার বিরুদ্ধে।

চিংগাড়ী বলতে লাগল—ছেলেটির বয়েস হবে ১০।১২ বছর। চেহারা দেখতে মোটামুটি ভালই। ৪।৫ বছরেই ওর ব্যবহার নাকি অন্যরকম বলে ওঁরা বুঝতে পারেন। জেদি, কথা বললে শোনে না। যখন তখন কারণে অকারণে মিথ্যা কথা বলে। চুরি ক'রে এটা ওটা খায়। ধরা পড়ে বকুনি খায় তাতে লজ্জাবোধ করে না। জেদ নাকি ক্রমে বেড়েই চলে। ভদ্রলোক কলকাতার বাইরে তখন কাজ করেন—ছেলেটি সেখানের পাশের বাড়ীর একজনের এক ছেলের সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া ক'রে সেবাড়ীর অনেক কাঁচের, চীনামাটির জিনিষ ইচ্ছে ক'রে ভেঙ্গে নিজের বাড়ীতে চলে আসে। পরে সেবাড়ীর গিন্নি এসে খবরটা বললে সুমনকে, ছেলেটির ঐ নাম, তার মা ডেকে জিজ্ঞেস করতে সে বললে নিজে সে অনেক বারণ করেছে, থামাতে চেষ্টা করেছে কিন্তু তবু ঐ বাড়ীর ছেলেটি সব নিজে ভেঙ্গে দিয়ে তার নামে মায়ের কাছে লাগিয়েছে। সেদিন বকুনি মার খেয়েও সে স্বীকার করেনি নিজের দোষ পরে একদিন ঐ বাড়ীর পেয়ারা গাছে উঠে ছোটবড় প্রায় সব পেয়ারা নাকি পেড়ে ফেলে দেয় আর বাগানের ফুলের গাছ সব ভেঙ্গে ফেলে, তুলে ফেলে সব একাকার করে দেয়। চোখে কেউ সুমনকে এ কাজ করতে দেখেনি তবু এটাযে তারই কাজ সবাই বুঝলে। বকুনি খেলে কিন্তু সে স্বীকার করবে না।

তার বন্ধুর দলে সে ছিল অপকর্মের সর্দার। অন্যেরা তাকে দিয়ে নানা কুকাজ করিয়েছে। মায়ের মতে ঐ সব খারাপ ছেলের পাল্লায় পড়েই সুমন নষ্ট হয়ে গেছে না হলে ৫।৬ বছর পর্যন্ত সে নাকি একেবারে সোনার ছেলে ছিল। অনেক চেষ্টা করে ছেলেকে নিয়ে কলকাতার কাছেই এক সহরে বদলি হয়ে এলেন। সেখানে এসে অল্পদিনেই তার নতুন বন্ধুর দল জুটলো। বাড়ীতে যে সব ভদ্রলোক আসতেন তাঁদের ফেলে দেওয়া সিগারেট কুড়িয়ে সুমন লুকিয়ে গেতে আরম্ভ করল। বাড়ীর চাকর দেখতে পেয়ে বাবুকে বলে দেবার ভয় দেখায়। তাকে অনেক অনুরোধ করে থামায়। সেই থেকে নিজের খাবার লুকিয়ে কিছু কিছু খাবার সে চাকরকে দিতে থাকে। চাকরও তাকে প্রশ্রয় দেয়। ক্রমে বিড়ি, সিগারেট বেশ অভ্যাস হয়ে যায়। বাপের পকেট থেকে পয়সা চুরি করা চলতে থাকে। প্রথমদিকে ভদ্রলোক খুচরো পয়সার হিসেব ধরতে পারতেন না। এখন টাকা যেতে আরম্ভ করলো। সন্দেহ হওয়ায় চাকর বকুনি খেল তবু সে কিছু ফাঁস করে নি। বরং ছেলেটির অধঃপাতে যাবার নানা ব্যবস্থা সে পাকা করে দিলে। ঐ বয়সে তাকে নিজের যৌনখেলার সঙ্গী করে নিলে। দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা খুব বাড়াতে ক্রমে বড়দের সন্দেহ ও শাসন চলে। কাজ হয় না। সাবধান হয়ে টাকাকড়ি আর বাইরে না রেখে দেরাজে বন্ধ ক'রে রাখতে লাগলেন। তবু কম পড়ে। এদিকে বাড়ীর কাছের পানের দোকান থেকে বাকিতে সিগারেট এনে পরে কিছু বেশী দাম দিয়ে দোকানীকে ঠাণ্ডা রাখতো। এ সব খবর ধরা পড়াতে প্রবল শাসন চলে, চাকরটিকে তাড়িয়ে দেন। ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। কিছু দিনেই স্কুলের রিপোর্ট এলো ছেলে অন্যদের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করছে, বই খাতা ছিঁড়ে দিচ্ছে, অশ্লীল গালাগাল দিচ্ছে, ইত্যাদি। বাবা স্কুলে গিয়ে যা শুনলেন তা আরও অনেক বেশী। ছেলেটি নাকি অন্য ছেলেদের

সঙ্গে এমন সব আচরণ করে যাতে তাকে আর স্কুলে রাখা সম্ভব হবে না। মারধর অনেক করা হয়েছে—কিছুতে সে শোধরায় না, সুতরাং স্কুল থেকে তাকে ছাড়িয়ে দিতেই হবে। ৭।৮ বছরের ছেলের এমন ব্যবহার তাঁরা আগে দেখেন নি। বাড়ীতে শাসন হয়, বোঝানও হয়, ভোলানর চেষ্টা করা হয়। সব ব্যর্থ, কিছুতেই কিছু করা যায় না। বাবা মাকে দোষ দেন ছেলেটাকে একেবারে জাহান্নমে ঠেলে দিয়েছেন বলে। মা তীব্র আপত্তি জানিয়ে উল্টে দোষ দেন বাপের ঘাড়ে। ততোধিক চলে ছেলের উপর কড়া শাসন। ছেলেটির সেদিকে যেন ভ্রুক্ষেপ নেই। চেহারায় এখন নাকি কেমন একটা পাকা পাকা বিকৃত ছাপ পড়েছে। বাজারে দোকানীকে ঠকিয়ে বেশী জিনিষ নিয়ে পালায়। চুরি ক'রে জিনিষ কিছু এনে কম দামে বেচে দিয়ে সিনেমা দেখে। একদিন নাকি নেশা ক'রে আসে; ধরা পড়ে। এমন হল যে, সে বাড়ী থেকে একদিন পালিয়ে যায়। ৪।৫ দিন পরে তাকে ধরে আনা হয় এক গ্রামের বাজার থেকে। বাড়ীতে শাসনের চরম হতে থাকে। ঘরে তালা দিয়ে রাখা হল। সে নাকি ঘরেই পেচ্ছাপ পায়খানা ক'রে সারা দেয়ালে তা ছিটিয়ে ঘসে একসা করত। মা বাবা অনেক বুঝিয়েছেন। স্নেহ করে সঙ্গে নিয়ে দোকান থেকে ভাল জামা, খাবার এনে দিয়েছেন—সেও খুব হাসিখুসিভাবে সব নিয়েছে, গল্প করেছে, দু'একদিন পরেই আবার কিছু একটা ক'রে বসেছে। এমনি করে অতিষ্ট হয়ে ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে তাকে রাত্রে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। একদিন আবার পালিয়ে গিয়ে, কি ক'রে কি করেছে জানা নেই, সুমনকে তিন চার দিন পরে এক কুখ্যাত পাড়ার পাশের রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে একজন খবর দেয়। সেখান থেকে তাকে আনা হয়—তখনো তার ঠিক জ্ঞান নেই। মুখে মদের গন্ধ। সুস্থ করে তুলে তাকে ঘরে বন্ধ ক'রে আটকে রাখা হয়।

অনেক চেষ্টায় তার বাবা এবার কলকাতায় বদলি হয়ে আসেন। বাড়ী নিলেন উত্তর কোলকাতায়। অনেক চেষ্টা ক'রে খোঁজ নিয়ে বিশেষজ্ঞের মত নিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছিলেন। কিছুদিন ছোট খাটো বাড়ীর ঘটনা ছাড়া, কিছু ঘটে নি। হঠাৎ একদিন তাকে আবার পাওয়া যায় না। তখন বয়স প্রায় ৯।১০ হবে। দুদিন বাদে খবর এলো সুমন পুলিশের হেফাজতে আছে। বাবা মা গিয়ে শোনেন সুমন এক স্বর্ণকারের দোকানের পাশে বসে থেকে থেকে কোন সুযোগে দোকান থেকে সোনার একটা মালা চুরী করে নিয়ে পালায়। দোকানী যখন খোঁজ করলো তখন গয়না আর পেলো না। সুমন যেখানে সেটা বিক্রী করতে গিয়েছিল সেখানে সন্দেহ হওয়ায় তাকে ধরে পুলিশের হাতে দিয়ে দেয়। পুলিশ চেষ্টা ক'রে সব খবর বের করে। মা বাবাকে দেখে সুমন একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে প্রথমে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষী জানাতে চায়। বাবা কঠিন, মা কাঁদতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সে স্বীকার করে নিজের দোষ। এমন কাজ সে আর জীবনে করবে না—তাও বার বার বলতে থাকে। বাবা মায়ের দায়িত্বে সেবারের মত খালাস পায়। বেশ কিছুদিন এবার সে ভাল থাকে। বাড়ীতে পড়া শোনাও কিছু চলে। হঠাৎ আবার একদিন সে নিরুদ্দেশ। সন্ধান করে মায়ের একটা আংটী পাওয়া গেল না। সেটা নাকি সুমন যাবার দিনই তিনি খুলে আয়নার দেরাজে রেখেছিলেন, চাবিটা সেখানেই রেখে স্নান করতে যান। পরে এসে চাবি নিজের আঁচলে বাঁধেন। এই সময়টুকুর মধ্যে সেটা উধাও হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে সুমনও। ৩।৪ দিন কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। পরে সে ধরা পড়ে, কলকাতায় আসবার আগে যে সহরে ছিল সেইখানে। পকেটে তখনো সেই আংটী। এবার তাকে শিশু অপরাধীদের জেলে কাটাতে হয় তিন মাস। অনেক করে আবার তার বাবা তাকে ছাড়িয়ে আনেন। বাড়ীতে ফিরেই

তার বড় বোনকে এমন ভাবে আক্রমণ করে যে তাকে দুজনে মিলে ধরে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। কাপড় ছিঁড়ে কামড়ে রক্তাক্ত ক'রে দেয়। মারধর—বেঁধে রাখা—সবই হয়েছে। পাড়া বদল ক'রে বালিগঞ্জে বাড়ী ভাড়া নিয়ে এসে মনোবিদের পরামর্শ নিয়ে ছেলের সংশোধনের চেষ্টা করছেন। প্রায়ই তবু শোনে মারধর, কান্না বা নানারকম বুঝিয়ে কথা বলা চলছে পাশের বাড়ীতে। ভদ্রলোক নিজেও আর স্থির থাকতে পারেন না। ছেলে একটু সুযোগ পেলেই কিছু একটা ক'রে বসে। বাড়ী থেকে বেরুতে দেন না সঙ্গে কেউ না থাকলে। যত্ন স্নেহও ত কম করেন না। তবু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এর মধ্যে একদিন তার বাবার দরকারী কাগজ পত্র আর মায়ের দামী একটা শাড়ী নিয়ে উনুনে ফেলে পুড়িয়ে দিয়েছে। কেন এরকম করে কিছু তা বলে না। বুঝিয়ে বল্লে বলে আর করবে না। ভাল খেতে দিলেই সে ভাল থাকবে। কাজে কিন্তু তা হয় না। অনেক টাকা খরচ করছেন, অনেক চেষ্টা করছেন, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আজকে আবার কি ঘটেছে কে জানে। বসে বসে কথা শুনেছি, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে অন্য কথাও জেনে নিয়েছি। সব কথার উত্তর চিংগাড়ী দিতে পারে নি। জানে না। শুনে কেমন যেন নিজেরই সব গোলমাল হয়ে গেল। কী বলবো? তাই ত, কত সইতে পারে বাপ মা। কিন্তু ছেলেটির—? একবার তাকে দেখতে খুব ইচ্ছা হতে লাগলো। তখন বিকেল হয়ে গেছে। কখন যে সামনে চা জল খাবার কে দিয়ে গেছে তা ভাল করে লক্ষ্য করিনি। আবিষ্টের মত খেয়ে গেছি আর ছেলেটির জীবনী শুনে গেছি। বন্ধু বল্লে, ভদ্রলোকের কাছেই সে সব শুনেছে। এক একদিন এমন হয় তিনি নিজেই এসে এ সব কথা তাকে বলেন। কি করা যায় তা নিয়ে আলোচনাও করেন।

ও বাড়ীর কান্না চিৎকার কখন থেমে গেছে টের পাই নি। সুমনের কথাই ভেবে গেছি। ঘরে বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে বোধহয়। হয়ত কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। কে জানে হয়ত আবার কোনো মৎলব আঁটছে। বন্ধু বলেছিল কোনো পত্রিকায় আর একবার রেডিওর আলোচনায় নাকি জেনেছে এ ধরণের অস্বভাবী সন্তান নাকি বাপ মায়ের নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধের মানসিক অমিল আর তার ফলে সন্তানের প্রতি স্নেহ ভালবাসার উপযুক্ত পরিমাণ ও রকমের অভাব থেকেই হয়। জিজ্ঞেস করেছিলাম সুমনের বাপ মায়ের মধ্যে কি মনের মিল নেই? উত্তর পেয়েছিলাম সে খবর চিংগাড়ী ঠিক কিছু জানে না। মাঝে মাঝে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় শুনতে পায়। কখন কখন একটু স্বর বেশীই চড়ে কিন্তু কি নিয়ে কি কথা হয় তা জানে না। মনে করে তাঁরা ত ঐ ছেলের কিছু নিয়েই তর্ক করেন। আগের কথা জানবার কোনো সুযোগ তার নেই। এ সম্বন্ধে তার মত জানতে চেয়েছিলাম। নিজের অক্ষমতা জানিয়ে বলেছিল সে এ সব বিষয় কিছুই জানে না। তার কেমন নাকি মনে হয় বাবা মা ছেলে তিন জনেই যেন এর কোন প্রতিকার করতে অক্ষম। কী করবেন বাবা মা? চেষ্টা করেছেন, ভাল ব্যবহার করেছেন, শাসন করেছেন, বিশেষজ্ঞের উপদেশ নিয়ে চেষ্টা করেছেন তবু কিছু করতে পারলেন কি? নিজেরা কি আর করবেন। সমাজে দশ জনের মধ্যে থাকতে হয়, বাড়াবাড়ি হলে লজ্জা হয়। অসম্মান হয়। নিজেদের মনে গ্লানিও হয় কম না। তবু কিছু ত করতে পারেন না। বড় নিরুপায় বোধ করেন তাঁরা। রাগ মাঝে মাঝে হয় সত্যি। সবটুকু সামলাতেও আর পারেন না। ফল হয়ত খারাপই হয়—কিন্তু কি করবেন? আর ছেলেটি! তার জীবনের এ কী বিকৃত রূপ! কেন সে এমন করে? নিজে ইচ্ছে ক'রে কি করে? বন্ধুর নাকি সন্দেহ হয় এ নিশ্চয় এক রকমের পাগলামি। না হলে এরকম

হতে পারে না। ঐ কচি বয়েস—সে কী না করছে। গায়ে তার মারের ব্যথা লাগে না তা হতে পারে না। মনে কি তার দুঃখ বোধ জাগে না? ঠিক বুঝতে পারে না। সুমনের কি মান অপমান বোধ নেই? সব শিশুরই ত আছে তবে তার নেই কেন? এটা তবে কি রোগ নয়? নিশ্চয় রোগ বলে তার মনে হয়।

মনের যে আক্রোশ নিয়ে পথের মধ্যে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম সে মনোভাব আর নেই। সব কথা শুনে কেমন যেন সত্যি সব গোলমাল হয়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মনটা তীব্রতা একদিক থেকে ছেড়েছে বটে কিন্তু অন্যদিকে আবার যেন ক্রমে জেগে উঠছে। চিংগাড়ীর দেওলাস সহানুভূতিপূর্ণ মন নিয়ে বিষয়টার সম্বন্ধে ভাববার চেষ্টা আছে। এতে আমার মনেরও একচোখামো ভাবটা যেন থেমে গেছে।

সুমনের তবে কী হল! আর বসে থাকতে ইচ্ছা হল না। উঠে পড়লাম। বন্ধু বল্লে—"তুমি হঠাৎ উঠে পড়লে! ভাবছো বুঝি! আবার এসো ভাই ছাতু, অনেকদিন পরে দেখা হল তবু কিছু আলাপই করতে পারলাম না। নিশ্চয় এসো ভাই।" আমার ঠিকানাটাও জেনে নিলে।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে এক গাছের ছায়ায় লেকের ধারে এসে একা বসেছি। জলের দিকে চেয়ে আছি। একটু বাতাসে জল কেঁপে ওঠে আবার থামে। দেখতে মন্দ লাগছে না। কখন সে ঢেউ অন্ধকারে দৃষ্টির আড়াল হয়েছে ঠিক বুঝতে পারিনি। স্পষ্ট ক'রে কিছু ভেবেছি বলেও মনে হচ্ছে না। তবু বসেছিলাম যেন কিছু ভাবনা মনে হয়ে চলেছিল। টের পেলাম যখন ফেরিওয়ালা কাগজের একটা মোড়ক আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ধরে বলে "এই নিন বাবু, ছয় নয়াপয়সা"। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম এ কী? কি দিচ্ছ? সে বলে "মশ্‌লা মুড়ি—, খেয়ে দেখুন গরম তাজা আছে।" "মশ্‌লা মুড়ি তা আমায় দিচ্ছ কেন? ও সব আমি খাই না।" "খান না তবে ডেকে এক আনার দিতে বলেন কেন।" এক আনার দিতে বল্লাম! ডেকে এনে, আমি! এসব কি বলছে? রাগ হল। বল্লাম "এসব তুমি কি বলছ? কে ডেকেছে তোমাকে? মগের মুল্লুক পেয়েছ যে জোর করে গছিয়ে দেবে।" ততক্ষণ সে অনেক কথা কি সব বলে গেছে। তার মূল বক্তব্য এই যে আমি তাকে ডেকে এক আনার দিতে বলে এখন অস্বীকার করছি। পয়সা না থাকে তা সোজা বলে দিলেই ত পারি এমন সাধু সাজবার কি আছে। মিথ্যে হয়রানি করা কেন ইত্যাদি। মেজাজ খারাপ লাগলো, বল্লাম—বেশী বাজে বকো না বলছি—যাও। "বাজে আপনি বকছেন না আমি! ডেকে এনে না নিয়ে আবার মেজাজ গরম করছেন—কেমন বাবু আপনি? ভদ্রলোক না মাথা খারাপ!" বলে সে ঝাঁকাটা মাথায় তুলে বক বক করতে করতে অন্ধকারে এগিয়ে গেল। কথাটা আমার যেন সম্বিৎ ফিরিয়ে আনলো। মাথা খারাপ! আমার মাথা খারাপ! কী জানি, ডেকে এনেছি এক আনার দিতে বলেছি আর আমার কিছুই মনে নেই! এ কী রকম হল! সুমনের প্রভাব কি আমার মধ্যেও এসে গেছে! সুমনেরও কি তবে এই রকমই কিছু হয়! সে ঝোঁকের মাথায় কি করে তা সে জানে না বুঝতে পারে না, এমনও ত হতে পারে! হতে পারে, আমারই যখন এখনই তাই হল, তার কেন হতে পারবে না! নিশ্চয়ই হতে পারে। হয়ত তাই তার হয়। তবে তাকে দোষ দেওয়া চলে কি? আর মারধর শাসন কি তার প্রাপ্য। সে কী করবে? বন্ধু ঠিকই বলেছে তারা তিনপক্ষই নিরুপায়। কিন্তু তবে—? তবে এর উপায় কি? বাপ মা অশান্তি ভোগ করেই চলবে আর সুমন সারাজীবন ধরে এই দুঃখ কষ্ট, আনাদর অবহেলা আর অশ্রদ্ধা বয়ে বেড়াবে! কেন? প্রতিকার কিছুই কি নেই! এতই নিরুপায় অসহায় আমরা—! তবু সুমন কেন কষ্ট পাবে, কেন?

লেকের জলে দোল খাওয়া তারার আলোর বদলে বাড়ীর সামনের দরজা। কখন সেই ফেরিওয়ালার—অনুসরণ করে অন্ধকারে পথ হেঁটে ট্রাম কি বাসে চড়ে বাড়ী এসেছি ঠিক খেয়াল নেই।

গভীর রাত্রে ঘুম আসে না। তবু চুপ করে শুয়ে আছি। কোথাও যেন কিছু নেই, পৃথিবী যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। ইচ্ছা হল সুমনের পিঠে গায়ে হাত বুলিয়ে দিই। তাকে নতুন জীবনে ফিরিয়ে আনি। কিন্তু কোথায় সে, কোথায় আমি! তবু!

পাশের জানালা দিয়ে দেখি দূর কালো আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডলের প্রকাণ্ড প্রশ্নবোধক চিহ্নটা তেমনি পরিচিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কত হাজার হাজার যুগ আগে থেকে ঐ সাত ঋষি কোন যুগ যুগান্তের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে খুঁজে মূক হয়ে আছেন। ধ্রুব তারাকে ঘিরে ঘিরে সপ্তর্ষির সেই অনন্তকালের প্রশ্নের উত্তর মিলেছে কি? রাতের আকাশ, তমিস্রায় ঢাকা, তেমনি মূক।

লুম্বিনী সম্বন্ধে—

গত সংখ্যা চিত্ত পত্রিকায় আমরা আয়ুর্বেদীয় ঔষধ মানসিক রোগ চিকিৎসায় প্রয়োগ করা ও সে সম্বন্ধে গবেষণা করা প্রয়োজন বলিয়াছিলাম, ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আর বলিবার প্রয়োজন নাই। জনসাধারণের এবং মানসিক রোগ চিকিৎসকগণের এবিষয় মনোযোগী হইতে আমরা পুনরায় অনুরোধ করিতেছি। রাজ্য সরকার এ সম্বন্ধে কিছু চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া আমরা জানিনা। এই প্রকার কাজে সরকারের সহযুতা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের স্বাধীন দেশের নিজেদের সরকার জনসাধারণের মধ্যে দেশের নানান্ দিকের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রচার ও শিক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিবেন ইহাই দেশবাসী আশা করেন। আমাদের দেশে তাহা হইতেছে কী? যাঁহারা সরকারী কাজে নিযুক্ত আছেন বা কোনও বিশেষ বিভাগের পরিচালক হইয়া কাজ চালাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই যোগ্যতার দিক হইতে সমান উপযুক্ত এমন হইতে পারে না। এমনও অনেকে আছেন যাঁহারা যে বিভাগে কার্য করিতেছেন অন্যান্যদেশে সে বিভাগের সর্বদিকের যে সব উন্নত হইতেছে তাহার সম্বন্ধে তাঁহাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান নাই। ইহা অনেক বিষয়ে সম্ভবও নহে। বিশেষতঃ এই যুগে বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির দিনে বিশেষজ্ঞগণের পক্ষেও বিশেষ বিজ্ঞানের সকল উৎঘটিত তত্ত্বের ও তথ্যের সঙ্গে পরিচিত থাকা কঠিন হইয়া উঠিতেছে। তেমনই চিকিৎসার বিষয়ও এই কথা বলা চলে। আমাদের দেশের সরকারী পরিচালকগণ দেশের বিশেষজ্ঞগণের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিলে ফল শুভ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। স্বাধীন দেশের শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ আর নাই। যাঁহারা রাজ্যের পরিচালনার কার্যে নিযুক্ত তাঁহাদের সহিত রাজ্যের জনগণের স্বার্থের কোনও দ্বন্দ্ব নাই। সুতরাং অধিকতর কল্যাণের জন্য প্রত্যেক বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। ইহাতে নানান্ মতের সহিত যেমন পরিচিত হওয়া যায় তেমনই বিভিন্ন মতের মধ্যে দেশের অবস্থা বিবেচনায় কোন মত কতখানি কার্যে পরিণত করা সম্ভব সে বিষয়েও বিচার বিবেচনা করিয়া দেখার সুবিধা হয়। ইহা ছাড়াও বহু মতের মধ্যে যে মতের যতটুকু উপযোগী সে বিষয় আলোচনা করিয়া একটা মিলিত সুপরিকল্পিত আদর্শ নির্দ্ধারিত করার পক্ষেও ইহা সহায়ক। আমাদের দেশের কর্ণধারগণ এইদিকে অধিকতর নজর দিবেন আমরা এই আশা করি।

জনহিতকর কাজ প্রধানতঃ ও মূলতঃ দেশের সরকারের দায়িত্ব হইলেও ইহাই একমাত্র জনকল্যাণের পথ নহে। প্রত্যেক দেশেই যেমন সহানুভূতিশীল, দয়ালু, বিত্তবান মানুষের অভাব নাই, বাংলাদেশে ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও তেমন সহৃদয় বিত্তবান লোকের অভাব নাই। বহু জনকল্যানকর প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের এবং জনসাধারণের সাহায্যে চলিতেছে। লুম্বিনিও এই শ্রেণীর একটি প্রতিষ্ঠান। মানসিক রোগ সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব আজও সামগ্রিক ভাবে সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিতে পারে নাই। লুম্বিনির দীর্ঘ ২২ বৎসরের সেবা এদিকে অনেক পরিমাণে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। চিত্ত পত্রিকাও মানসিক রোগীর দুঃখ কষ্ট ও তাহাদের অসহায় অবস্থা এবং তাহার প্রতিকারের দিকে নিয়মিত ভাবে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিছু সুফলও দেখা যাইতেছে। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা আশা করিতেছি মানসিক রোগ চিকিৎসার উন্নয়নের জন্য আমাদের অর্থ সাহায্যের আবেদন ক্রমে সফল হইবে। আয়ুর্বেদীয় ঔষধও, গবেষণার ফলে, মানসিক রোগ চিকিৎসায় ফলপ্রসূ হইবে।

দুরারোগ্য মানসিক রোগীদিগকে তাঁহাদের পরিবার হইতে সরাইয়া রাখা যে কত প্রয়োজন তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। যক্ষা রোগ নিবারণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আজকাল মধ্যে মধ্যে হৈ চৈ কিছু শোনা যায়। দুঃখের বিষয় মানসিক রোগ ও রোগী সম্বন্ধে আমাদের চেতনা আজও স্তিমিত হইয়া আছে। একদিক হইতে বিচার করিলে মানসিক রোগ যক্ষা রোগ হইতেও সমাজ জীবনের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকর ও ভাবিকালের ব্যক্তিগত পরিবার এবং সমাজ উভয়ের পক্ষেই অধিকতর অশুভ সম্ভাবনায় পুর্ণ। কবে আমরা এ বিষয় সজাগ হইব। সময় যত যাইতেছে অনিষ্টর পরিমাণ তত চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িতেছে। আমাদের চরিত্রে আজও জগন্নাথের রথের প্রভাবটাই প্রবল রহিয়াছে। হাজার হাজার লোকের টান রশিতে না পড়িলে মনের রথ নড়ে না। অনেক বিষয়ই আমরা আজও প্রায় "ঠুঁটো জগন্নাথ" হইয়াই রহিয়াছি। ইহাই কি বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষের বাংলাদেশ!

১৯৬১ ইং সনের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে লুম্বিনির আয় ব্যয়ের হিসাব ও অন্যান্য তথ্যাদি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

লুম্বিনি পার্ক ১৯৬১ ইং সন

	ভর্তি	নির্গম
এপ্রিল ১৯৬১	৪৫	৪৩
মে ১৯৬১	৪২	৩৩
জুন ১৯৬১	৩৬	৩৮
মোট—	১২৩	১১৪

চিকিৎসার ফলাফল

	আরোগ্য	উন্নতি	অপরিবর্তিত	মোট
এপ্রিল	১৭	২২	৪	৪৩
মে	১৬	১৫	২	৩৩
জুন	২৩	১০	৫	৩৮
মোট	৫৬	৪৭	১১	১১৪

বহির্বিভাগের মানসিক রোগী

	নূতন	পুরাতন	মোট
এপ্রিল	৬১	৩২৩	৩৮৪
মে	৪৯	৪৯২	৫৪১
জুন	৫৬	২৮৪	৩৪০
মোট	১৬৬	১০৯৯	১২৬৫

আয় ও ব্যয়

	আয়	ব্যয়
এপ্রিল	২৪,৫৯৩'০৪	৩৬,৫৪১'৩৫
মে	২৫,১৭৭'৩২	২৫,৫০১'৫২
জুন	*৪৬,৪৯৮'১৫	৩১ ০৩১'০২
মোট	৯৬,২৬৮'৫১	৯৩,০৭৩'৮৯

* ১৯৬১ সনের পঃ বঃ সরকারের নির্দিষ্ট ১০টি ফ্রী বেড-এর এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৬৫০০৲ ইহার মধ্যে ধরা আছে।

তরুণচন্দ্র সিংহ

Published by Dr. Tarun Chandra Sinha, D.Sc, for and on behalf of the Indian Psychoanalytical Society from Lumbini Park (Mental Hospital) 115, Dr. Girindra Sekhar Bose Road, Calcutta-39 and Printed by him from the Indian Photo Engraving Co. Private Ltd., 28, Beniatola Lane, Cal-9.